বঙ্কিম ভাবনায় নারী

ড. শিপ্রা মজুমদার

শুরুতেই বলা ভালো বঙ্কিম ভাবনা আমার লেখায় আবর্তিত হবে মুখ্যত তাঁর উপন্যাসকে ঘিরেই। তাঁর নারী ভাবনার বিকাশে মাঝে মাঝে অন্যান্য প্রসঙ্গের কোনো কোনো দিক হয়তো লেখার অঙ্গনকে স্পর্শ করে যেতেও পারে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রত্যেকেই প্রথম জীবনে দু'এক ছত্র কবিতা রচনা করেছেনই; বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটে নি। ''কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন। ...সেকালে লোকে যে সকল ইংরাজি কাব্য পড়িত, সে সকলই বঙ্কিমবাবুর পড়া ছিল।" তিনি কবি, সঙ্গীতকার, গানের কথাকারও বটে। আধুনিককালে অনেকেই গীতিকবিকে কবি হিসেবে মান্যতা দিতে অস্বীকার করেন। একদিন এক আলোচনা সভায় বেশ কিছু সাহিত্যসেবীর সমাগম হয়েছিল, এবং তাঁদের একাংশ বঙ্কিমের লেখা গানের একাংশ আবৃত্তি করে গীতিকারের উদ্দেশ্যে বলেন – 'এমন ভাল জিনিসটিকে আধ সংস্কৃত আধ বাঙ্গালায় লিখিয়া মাটি করা হইয়াছে, এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত। লোকের ভাল লাগে না।' গীতিকার ঈষৎ কুপিত। বললেন, 'আচ্ছা ভাই ভাল না লাগে পড়ো না। আমার ভাল লেগেছে তাই ওরকম লিখেছি। লোকের ভাল লাগবে কি না ভেবে আমি লিখব!'

গীতিকার বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের বিখ্যাত ও সুপরিচিত 'বন্দেমাতরম্' গানটির কথাই এখানে বলা হয়েছে। যে গানটি নিয়ে আ-সমুদ্র হিমাচল উদ্বেলিত ও আলোড়িত হয়েছিল; আর সাহিত্যসেবী মহল থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পৌঁছেছিল বিরূপ

সমালোচনা। তাতে তিনি টলেননি। একদল সমালোচক বঙ্কিমবাবুকে সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন এই বলে – "বঙ্কিমবাবু নভেল লিখে বঙ্গ-যুবক যুবতীদের উচ্ছন্নে পাঠাচ্ছেন"। ক্ষতবিক্ষত বঙ্কিম। বঙ্গীয় যুবক-যুবতীদের উৎসন্নে পাঠাবার অভিযোগ যাঁর বিরুদ্ধে, তাঁকেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবি হিসেবে স্থান দিয়েছেন বাইরন আর কালিদাসের পর। মুখে বলে নয়, প্রবন্ধ লিখে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন – "তিনজন কবির বহি কলেজের ছাত্রেরা খুব আগ্রহের সহিত পড়ে। এবং এই তিনজন কবির কথা লইয়াই তাহারা আপনাদের 'চরিত্রগঠন করে' – সেই তিন জন কবি – বাইরন, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র।" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত সেই প্রবন্ধের নাম 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি'। অবাক কাণ্ড বঙ্কিমচন্দ্রকে বাস্তবে সহ্য করতে হয় পরস্পর বিরোধী সমালোচনা এবং এমন কি তাঁকে বলা হয়েছে 'বিকৃত মস্তিষ্ক'।

বঙ্কিম চরিত্রটি মোটেও বঙ্কিম নয় বরং সরল। বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা পদ থেকে সরে যাবার বেশ কিছু দিন পর শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্গদর্শনে যোগদান করেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেন নি; তাঁর ইচ্ছা হয় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীলেখার। সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সরল বিনয়ে তাঁর জীবনের কথা মাঝে মাঝে গল্প করে শোনাবার কথা বলেন। তিনি বলেন তাঁর জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন; একজনের প্রভাব তাঁর জীবনে বড় বেশী রকমের – সে হল তাঁর পরিবারের। নিজের পত্নীকে এতটাই ভালোবাসতেন বঙ্কিমচন্দ্র; যে সে প্রায় দৃষ্টান্তমূলক। সে এক গল্প আছে – ট্রেন যাত্রার সময়ে নিজের স্ত্রীর দিকে তাকানোর জন্য এক যুবকের প্রতি কতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি! পত্নীপ্রীতি বঙ্কিমচন্দ্রকে অবশ্যই বিশিষ্টতা দিয়েছে; আর পত্নীকে তিনি কল্যাণ স্বরূপা জ্ঞান করতেন নিজের জীবনে। আদর্শ পতি ও পত্নীর বিজ্ঞাপন বৈকি তাঁরা। এমন পারস্পরিক সম্মান একমাত্র দেখা যায় সমকালীন পূতচরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদায়। বঙ্কিম বলেছেন – "আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম-প্রমাদ তিনি জানেন আর আমি জানি। এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অতুলনীয়।" নারী জাতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই শ্রদ্ধাবোধের জায়গা থেকেই তাঁর নারী ভাবনা সম্পর্কে ধারণার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে।

বঙ্কিম কখনো বলেছেন – "সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?" অর্থাৎ তিনি নারী সৌন্দর্য্যের প্রতি বিমুগ্ধ পুরুষ; সৌন্দর্য পিয়াসী, রূপমুগ্ধ, রূপে চঞ্চল, তপঃভঙ্গ এক পুরুষ; নারীপ্রেমে যতটা তিনি পাগল ততটাই তিনি অন্তরে শ্রদ্ধাশীল নারীর প্রতি। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর মতিগতি আশ্চর্য রকমের। বঙ্কিম ভাবনা আবর্তিত-বিবর্তিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে নানান নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে। বিচিত্র আলোকরশ্মির বিকিরণে তাদের মধ্যে ধরা পড়ে নানা রংয়ের বহুস্তরিক ছায়া। সেদিনের প্রধান চরিত্ররা বাঙালী জীবনের ওতপ্রোত সঙ্গী হয়ে আছে কয়েক শতক ধরে; অথচ তাঁর সুবিপুল উপন্যাস আঙিনার এধারে-ওধারে ছড়িয়ে থাকা অজস্র অপাঙ্‌ক্তেয় নারী চরিত্র যারা চিরকাল থেকে যায় বিস্মৃত। পাঠকের গহন মনের গভীর অন্তঃস্থলে স্থান করে নিয়ে রাজত্ব কায়েম করে ফেলে রোহিনী, কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী, তিলোত্তমা, বিমলা, প্রফুল্ল প্রভৃতি চরিত্রগুলি। অন্যদিকে অপ্রধান নারীচরিত্রগুলিও কিছু পূর্ণতা দেয়, বিকশিত করে সমগ্র জীবনপটকে অথচ তারা আমাদের অপরিচিতই থেকে যায়। কিন্তু

তাদের জীবনেও আছে ভালোবাসা, প্রেম, প্রীতি, ঈর্ষা, হিংসা, কুটিলতা, ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা, লোভ, লালসা প্রভৃতি। এইসব নিয়ে জীবনের বহুরঞ্জিত প্রবৃত্তির প্রকাশ এক একটি নারীচরিত্রের মধ্যে। সেই মানুষগুলোর অবগুণ্ঠিত থাকা অন্যমুখের সন্ধানে গিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় তাদের আঁতের কথা, সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না ভরা জীবনের কথা। এদের মধ্যে যেমন আছে নাপিতানি থেকে গোয়ালিনী তেমনই আছে বারবণিতাও। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একই লেন্সের আলোয় দেখলে এদের মাত্রাগত ব্যবধানও আমাদের চোখে আভাসিত হয়।

উপেক্ষিতা নারীর ভিড় শুধু ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের উপন্যাসের পাতায় বা পাঠক মনের গভীরে নয়, সাহিত্যে এদের উপস্থিতি চর্যাপদের সময় থেকে। চর্যাপদের প্রথম বাংলার সমাজ জীবনের নীচু তলার নারীদের জীবনচিত্র উঠে আসে। শুধু চর্যাপদ কেন চর্যাপদের কাল থেকে বয়ে আসা আজ পর্যন্ত যে সমস্ত সাহিত্য; সেই সমস্ত সাহিত্যের অভিজাত চরিত্রের পাশাপাশি অনভিজাত–ব্রাত্য চরিত্ররাও অপ্রতিহতভাবে বহমান। সামাজিক শ্রেণীভেদে এই চরিত্রদের মধ্যের ব্যবধান সমাজের মুরুব্বিদেরই সৃষ্টি, সাহিত্যের রসগ্রাহী সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী পাঠকদের নয়। উপেক্ষিত এবং অভিজাত সে যে কোনো চরিত্রই হোক না কেন, তা সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো পূর্বসূরী ছিল না – "সে যেন একেবারে কবচকুণ্ডলধারী কর্ণের মতই আমাদের ভাষায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।"[১] নর-নারীর আদিম আকর্ষণের তাগিদে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে জীবন্ত; আবার সৌন্দর্যের সংস্পর্শে প্রতিটি চরিত্র হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য। প্রতিটি চরিত্রই সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। হৃদয়ের রক্তক্ষরণেই তাদের প্রেমের ঘোষণা। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে কোনো টাইপ চরিত্র সৃষ্টি না করে নর-নারীর সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রকে রক্ত-মাংসের সজীব মানুষ করে তুলেছিলেন। কখনো তারা প্রেমের আহ্বানে উন্মনা, প্রেমের বাধায় উতলা, বিরহে কখনো তারা অশ্রুসিক্ত, মিলনে বিমুগ্ধ চিত্ত তৃপ্ত, কখনো প্রেমের স্নিগ্ধ স্পর্শলাভে দয়িতের মঙ্গলকামনায় ত্যাগের মধ্য দিয়ে অনন্তের সন্ধানে যাত্রা করে, আবার কখনো প্রেমের কারণ স্বরূপই হয়ে ওঠে ছলনাময়ী। বহুমুখী চরিত্রের কারখানা ঘর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের নারী ভাবনার সঙ্গে মিলে মিশে আছে তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কিত ভাবনাও। মূলকথা 'সৌন্দর্য বা রূপ' সম্পর্কে যৌন-আকর্ষণ ও সৌন্দর্যের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনায় – 'মানুষ দেহসর্বস্ব নয়, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবও বটে, কাজেই অন্ধভাবে যৌন আকর্ষণের প্রেরণায় চালিত না হয়ে নিজেকে সামাজিক আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসারে চালিত করতে চেষ্টা করবে। তাতে মনুষ্যত্ব-চর্চার পথ প্রশস্ত ও সুগম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে একাজ ধর্মের গন্তর্গত।"[২] .... সমাজ সাধনা তাঁর কাছে ধর্মসাধনার অন্তর্গত। কাজটি স্বভাবতই কঠিন, কিন্তু কঠিনতর হয়ে দাঁড়ায় যখন যৌন আকর্ষণের সঙ্গে যুক্ত হয় সৌন্দর্য বা রূপ। বঙ্কিমের উপন্যাস-জগৎ সৌন্দর্যময়। উপন্যাসের পাত্রপাত্রী, মুখ্য-গৌণ সবই সুন্দর। সৌন্দর্যের কশাঘাতে পাগল হয়ে অন্ধভাবে প্রকৃতির অঙ্গুলিহেলনে সবাই ছুটে চলেছে। সৌন্দর্য যেন প্রকৃতির হাতের চাবুক। জীবনের সুখ-দুঃখ, ট্র্যাজেডি-কমেডি, স্বর্গ-নরক সমস্তই সেই যৌন তাড়নারই পরিণাম। বঙ্কিমচন্দ্র সেই যৌনতার দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করেন –

"হায়, রমণী রূপলাবণ্য, এ সংসারে তোমাকেই ধিক্"। প্রেম হলো সেই অনুভব যার স্পর্শে হৃদয়ের মৃদঙ্গ বাজে; একজন অপরজনকে হৃদয় দান করে উভয়ের কাছে সত্য হয়ে ওঠে। উভয়েই বহন করবে হৃদয়ের দায়িত্ব। যার অনুভব সুখ অপূর্ব। প্রেমের উপলব্ধিতে কোনো বিলাসিতা থাকে না, থাকে সত্যের উন্মোচন, গভীর মর্মকথা, উজ্জীবনী শক্তি। প্রেমের আর এক নাম প্রেরণা।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'Rajmohan's Wife' প্রকাশিত হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী'কে যথার্থ উপন্যাস রূপে চিহ্নিত করা হলেও আক্ষরিক অর্থে 'Rajmohan's Wife'-ই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস, এটি রোমান্সে ভরা উপন্যাস। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার রাজমোহনের; তার স্ত্রীর নাম মাতঙ্গিনী, রাজমোহন কোনো এক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মথুরের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র রাজমোহনের স্ত্রী মাতঙ্গিনী ফাঁস করে দিলে তাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ি ফিরে মাতঙ্গিনী প্রাণরক্ষা করে। দরিদ্র-অপাঙ্‌ক্তেয় নারীকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণে বাঁচিয়ে দিলেন; মেরে ফেললেন না। নারী যে পুরুষের হাতের পুতুলমাত্র নয় তারও বাঁচার অধিকার আছে এই অধিকার বোধ এখানে ক্রিয়াশীল। অন্যদিকে রাজমোহন ও তার সঙ্গী ভিক্ষুক ধরা পড়লে তাদের শাস্তি ও দ্বীপান্তর হয়। আর মথুর পালাবার ও আত্মরক্ষার পথ না পেয়ে আত্মহত্যা করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'একেবারে নাটক'। অভিনব এই অর্থে। প্রমথনাথ বিশী 'বঙ্কিম সরণী' গ্রন্থে এই বিষয়ে বলেছেন, 'মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যসূচনা যদি নাটকোচিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সূচনা একেবারে নাটক। এবং এ রীতি ভারতীয় সাহিত্যে নতুন। ... ভারতীয় সাহিত্যে কথা এপিক হতে পারে, ন্যারেটিভ হতে পারে, ড্রামাটিক কখনো ছিল না বঙ্কিমচন্দ্রের আগে।"[৩] দুর্গেশনন্দিনীর শুরু অভিনবত্বমণ্ডিত। উপন্যাসের শুরু থেকেই কৌতূহল ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন ঔপন্যাসিক। দুর্যোগের রাতে অন্ধকারে মন্দিরের মধ্যে অশ্বারোহী যুবকের সঙ্গে দুই স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ। পূজা দিতে এসে বাহক দাস-দাসীগণ দ্বারা পরিত্যক্তা সেই রমণীদ্বয়ের একজন অর্ধমূর্ছিত। রোমান্টিক প্রণয়কাহিনীর ওই ঘটনা ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে উড়িষ্যার মোগল পাঠান বিরোধ ও মোগলের দ্বারা উড়িষ্যার বিজয় এই ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা। দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমা, আয়েষা ও জগৎ সিংহের ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী এবং পাশাপাশি বিমলার লঘু রসাত্মক প্রণয় বৃত্তান্ত কিছুটা উপভোগ্যতা সৃষ্টি করেছে। প্লট প্রধান উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছেন চরিত্রের মনোভূমিকে আশ্রয় করে।

দুর্গেশনন্দিনী প্রেমের উপন্যাস। প্রেমের বিচিত্র রূপের প্রকাশ বঙ্কিম উপন্যাসে দেখা যায় – নারীও সেখানে নানাভাবে, নানা প্রেক্ষাপটে, নানা রূপে হাজির হয়েছে। প্রেমের ছন্দে নারী চলেছে দোদুল গতিতে – কখনো সমাজ নামক বস্তুর সামনে দিয়ে, কখনো তাকে লুকিয়ে তার পেছন দিক দিয়ে। দুর্গেশনন্দিনীতে ক্ষণিক সাক্ষাতেই জগৎ সিংহ ও তিলোত্তমার গভীর প্রেম সঞ্চারিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই বিমলার ভুলের সুযোগ নিয়ে পাঠান সেনাপতি ওসমান সসৈন্যে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং গড় মান্দারণ দুর্গ অধিকার করেন। যুদ্ধ চলাকালীনই

জগৎ সিংহ আহত হয়ে বন্দী হন। বীরেন্দ্রসিংহ, তিলোত্তমা ও বিমলাও বন্দী হয়। আহত জগৎসিংহকে রাখা হয় নবাব কতুল খাঁর কন্যা আয়েষার তত্ত্বাবধানে। ত্রিভূজ প্রেমের কাহিনী তৈরী হতে থাকে এখান থেকেই। বিমলার সচল উপস্থিতি এই উপন্যাসে লক্ষণীয়; সে বিধবা, কি সধবা কে জানে? সে অলংকার পরত কিন্তু একাদশী করত না। সধবার মতো সকল আচরণ করত। এই রমণী ক্রমশঃ পাঠকের কৌতূহলকে আকর্ষণ করে নেয়। বিমলার চিঠির মধ্যে অভিরাম স্বামীর যে পরিচয় উদ্‌ঘটিত তাতে নর-নারীর যৌবনমথিত সম্পর্কের টানাপোড়েনই দেখতে পাওয়া যায়। বিমলা স্বাধীনচেতা, অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী নারী। উপন্যাসের প্রায় সব চরিত্রই কখনো না কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই চরিত্রটির দ্বারা আলোড়িত হয়েছে। বিমলা 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নহে'; ইনি পশ্চিমদেশীয় এবং হিন্দুস্থান স্ত্রীলোকের বেশ ধারিণী। বীরেন্দ্রসিংহের স্ত্রী হয়েও বিমলা নিজের পরিচয় গোপন করে স্বেচ্ছায় দাসীর জীবন বরণ করে নিয়েছে। বিমলার বেশভূষা ও রূপরাশি সম্পর্কে বঙ্কিমের মত – "পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষীয়ান বেশভূষা? কেনই বা না করিবে? বয়সে কি যৌবন যায়? যৌবন যায় রূপ আর মনে; যার রূপ নেই, সে বিংশতি বয়সেও বৃদ্ধা; যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী। যার মনে রস নাই, সে চিরকাল প্রবীণ; যার রস আছে, সে চিরকাল নবীন। বিমলার আজও রূপে শরীর ঢল ঢল করিতেছে, রসে মন টল টল করিতেছে।"[৪] এই রূপের মোহে বীরেন্দ্রসিংহ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল বিমলার প্রতি। শশীশেখর ভট্টাচার্যের 'যৌবন কালের প্রবল দোষ'-এর আকাঙ্ক্ষা থেকেই শূদ্রী কন্যার গর্ভে শশীশেখরের ঔরসে বিমলার জন্ম। বিমলা অন্য দাসীদের তুলনায় আলাদা। দাসী হলেও স্বাধীনতার অভাব ছিল না তার। নারী হিসেবে বিমলা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে মূল্যহীনা নয়। পাঠক মনেও বিমলা বেশি ক্রিয়াশীল চরিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র তিলোত্তমার রূপের বর্ণনা যেমন দিয়েছেন, তেমন তার শরীর গঠনেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তিলোত্তমার সে রূপে কোনো লালসা জন্মে না, 'সে মূর্তি কোমলতা, মাধুর্যাদি গুণে চিত্তের সন্তুষ্টি জন্মায়, এ সেই মূর্তি।'[৫] এ চোখের ভঙ্গিতে কোনো কটাক্ষ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের কবি ভাবনা নারী ভাবনার উপর কিভাবে প্রভাব ফেলেছে তা আয়েষা চরিত্রটি বিশ্লেষণেই বোঝা যায়। কবি সত্তা মানুষের মনকে কোমল করে; বঙ্কিমের বহিঃ প্রকৃতির দুরূহতাকে মুক্ত করতে সহায়তা করেছে কবি প্রবৃত্তি। আয়েষা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আয়েষা প্রেমের প্রজ্জ্বলিত শিখা। সর্বদাই প্রেমের আগুনে জ্বল জ্বল করছে সে। সংযমী প্রেমের চূড়ান্ত প্রতীক সে। আয়েষার চারিত্রিক সংযম আয়েষাকে আরো উজ্জ্বলময়ী করে তুলেছে। প্রেমের আগুনে সবচেয়ে ক্ষতবিক্ষত আয়েষা। জগৎসিংহই তার হৃদয়ের সমস্ত স্থান জুড়ে – 'বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।' আয়েষার এই অনুভব পৌঁছয় না জগৎ সিংহের কাছে। জগৎ সিংহকে ভালোবেসে আয়েষা জীবনবোধের গভীর প্রান্তকে ছুঁয়ে গেছে। বঙ্কিমের নারী ভাবনার এ এক অভিনব প্রকাশ। আশমানি আর দিগ্‌গজের ভালবাসার মধ্য দিয়ে বঙ্কিম নারী মনের আর এক দিককে তুলে ধরতে চেয়েছেন; তা হল রসিকতার আড়ালে মানব মনের গভীর দুঃখকে জয় করতে শেখা। হাসির মধ্য দিয়ে দুঃখকে বরণ করা; আশমানি তাই মানব মনে ছাপ ফেলে।

'কপালকুণ্ডলা' প্রতিভার আনন্দ-স্ফূর্তি। সুন্দর, অদৃষ্টপূর্ব, একক সৌন্দর্য সহযোগে মানব

প্রকৃতির যে লীলা তারই পরিচয় বহন করে কপালকুণ্ডলা। বিশ্ব প্রকৃতি এখানে মানব মনের সহচর। প্রকৃতির সত্য নিরূপিত হয় মানব প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাতেই। বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট কপালকুণ্ডলার উৎপত্তি সম্পর্কে সহোদর পূর্ণচন্দ্রের মন্তব্য – "যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহকুমাতে (এক্ষণে উহাকে কাঁথি মহকুমা বলে) ছিলেন, তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরে কিছুদূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বন জঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে, ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত।"[৬] এই সন্ন্যাসী কাপালিকই উপন্যাসে আগাগোড়া উপস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিকের সঙ্গে যুক্ত করলেন নিজের জীবনদর্শনগত একটি কৌতূহল। বঙ্কিম মানব প্রকৃতির মূলে ছিল তাঁর গভীর জীবনজিজ্ঞাসা। 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' – তরুণীর কণ্ঠের এই ধ্বনি নবকুমারের হৃদয়তন্ত্রীতেই যে শুধু অনুরণিত হয়েছিল তাই নয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যে আজও সেই সুর ধ্বনিত হয়ে চলেছে। কাপালিক কর্তৃক কপালকুণ্ডলার প্রতিপালিত হওয়া ও তাদের সম্পর্ক নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেন একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে নরনারীর আদিম সম্পর্কের আকর্ষণকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। কাপালিকের নিকট কপালকুণ্ডলা supernatural power; মহাশক্তিস্বরূপা; বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কপালকুণ্ডলার উপরে প্রকৃতি প্রভাবের মনস্তত্ত্বগত মতবাদকে পরীক্ষামূলক ভাবে আরোপ করার চেষ্টা করেছিলেন।

সূর্যমুখী, রোহিনী, কুন্দনন্দিনী, মনোরমা সকলেই বঙ্কিম ভাবনার এক এক দিকের উদ্ভাসন। সেখানে বার বার উঠে আসে সামাজিক প্রেক্ষাপট, সমস্যা, নারী-পুরুষের কামনা-বাসনার সম্পর্ক, দহন-জ্বালার ইতিবৃত্ত, মানুষের জীবন, জীবনের অস্তিত্ব ও তাদের সংগ্রাম। এই রকম চিরন্তন ও শাশ্বত সমস্যার সাহসী প্রকাশ বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ'। এই উপন্যাসটি যখন লেখক লিখছেন তখন আইনসম্মতভাবে 'বিধবাবিবাহ' সমাজে প্রচলিত। ১৮৭২-৭৩ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তৎপরতায় 'বিধবাবিবাহ' আইন পাশ হয়। এই আইনের কার্যকারিতা কি মর্মান্তিক পরিণতি বহন করে আনে তার মূর্ত ছবি অংকিত হয় বঙ্কিমের এই উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্র আসলে নারী ভাবনার আশ্রয়ে সমাজ-সমস্যাকেই তুলে ধরেছেন তাঁর বেশীর ভাগ উপন্যাসে। প্রসঙ্গক্রমে পাঠক এই উপন্যাসে সূর্যমুখীর বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত মন্তব্য স্মরণ করতে পারেন।

'বিষবৃক্ষ' জীবনের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ এক উপন্যাস। সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপনলোকের মত আনাগোনা করছে। সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী দুই নারীর বৃত্তে ক্ষতবিক্ষত নগেন্দ্রনাথ; অন্যদিকে হীরা, কুন্দনন্দিনী দেবেন্দ্রনাথ এই ত্রিকোণ কাহিনীতে অন্তর্দ্বন্দ্বের দহনে দগ্ধ হীরা। এখানে কামনার তাগিদ যতটা ভালোবাসার তাগিদ ততটা নয়। কুন্দনন্দিনী উপন্যাসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সারাক্ষণই জ্বলতে জ্বলতে গেল। তাঁর দুর্বিসহ জীবনযন্ত্রণাই এই

উপন্যাসের প্রাণ। বঙ্কিমচন্দ্র তিন নারীর আঁতের কথা দিয়েই এই উপন্যাসকে ভরিয়ে তুলেছেন। 'ইন্দিরা' উপন্যাসে বঙ্কিম নারীমনস্কতার আর এক দিক উদ্‌ঘাটন করেন; তা হল যৌবনের অপরিতৃপ্ত প্রণয়বাসনা। 'ইন্দিরা' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে একটি লাস্যময়ী চরিত্র। তার বুদ্ধিদীপ্ত হাসির তরঙ্গে জীবনের গূঢ় তত্ত্বকথা উছলে ওঠে। ইন্দিরা সধবা হয়েও যেন জন্মবিধবা; কেননা বিবাহের সময় একবার মাত্র তার স্বামীদর্শন হয়েছিল। বঙ্কিম উপন্যাসে প্রধান নারী চরিত্রগুলি নিয়ে তাঁর ভাবনা এই ভাবেই পল্লবিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান নারীচরিত্র তথা অভিজাত সুন্দরী চরিত্রগুলির পাশাপাশি এমন কিছু অনভিজাত, অপ্রধান নারীচরিত্র আছে ক্ষণিকের আলোক বিচ্ছুরণে যারা দূর আকাশে ধূমকেতুর মতো মিলিয়ে যায়। সেই রকম কিছু চরিত্রের সাহায্যে লেখকের নারী ভাবনার অন্বেষণ করব – লেখক বঙ্কিমের এমনই এক চরিত্র গোয়ালিনী অমলা। সে স্বামীবিচ্ছিন্না যুবতী নারী। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে তার অভাবের সংসার। একদিকে সংসারের দারিদ্র্য অন্যদিকে মানসিক জীবনের যন্ত্রণা দুইয়ের দহনে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া এক নারী অমলা। অর্থের প্রতি তার বড় লোভ। ধনবান বণিক পুরন্দর অমলার হাত দিয়ে হিরন্ময়ীকে একটি মহামূল্যবান হীরকখচিত হার পাঠায়; কারণ সে জানতে পেরেছিল হিরন্ময়ী অমলার গৃহেই বাস করে। এমন অলঙ্কার অমলা কোনো দিন চোখেই দেখেনি। হীরের উজ্জ্বল দ্যুতিতে তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তবু নিজের লোভ সম্বরণ করে সে হার পৌঁছে দিল সে হিরন্ময়ীর কাছে। কিন্তু নির্লোভ, নিরাসক্ত, উদাসীন হিরন্ময়ী সে উপহার প্রত্যাখ্যান করে। তখন অমলা তা দেখে অবাক হয়ে যায়। হিরন্ময়ীকে সে বলে – "তুমি কি পাগল?" পার্থিব জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে ও এ উপহার গ্রহণ করা যেতেই পারে। অমলার পক্ষে লোভ সম্বরণ করে থাকা বেশিক্ষণ আর সম্ভব হয় না; সে অবিলম্বে সেই দামী অলঙ্কারখানি নিয়ে রাজা বামনদেবের দরবারে উপস্থিত হয় ও তার বিনিময়ে সে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়। তখন পরিতৃপ্তির আনন্দে তার মধ্যবিত্ত মন শান্তির আনন্দ খুঁজে পায়। অমলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক বঙ্কিম 'দরিদ্র-মধ্যবিত্ত-পতিবিচ্ছিন্না নারীর' মন মানসিকতা তুলে ধরেছেন অতি সহজে ও স্বচ্ছন্দে।

ফুলমণি নাপিতানি; যে হয়ে উঠেছিল মাতৃহীনা, স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা, প্রফুল্লর একমাত্র সঙ্গী একমাত্র আশ্রয়। নাপিতের বুদ্ধি ভয়ানক। মধ্যবয়সী ফুলমণি; লালপেড়ে শাড়ি পরে, পানের রক্তরাগে মুখ রঞ্জিত করে সে অভিসারিকা নায়িকার মতো এসে দাঁড়ায় দুর্লভের সামনে। মিলনের নিভৃত স্থান নিশীথ রাতে গভীর বন। ঘুট্ ঘুটে কালো অন্ধকারের মধ্যে কেবল দুই নারী-পুরুষ ফুলমণি ও দুর্লভ। অল্পবয়সের বিধবা-নারী; স্বামী সুখ বঞ্চিতা নারী ফুলমণি আর দুশ্চরিত্র গোমস্তা দুর্লভ, নারী মাংস লোলুপ, নারী শরীরের প্রতি লুব্ধ পুরুষ। তবে ফুলমণি ও দুর্লভ দুজনের প্রতি দুজনেই বেশ অনুগত। এদের বোঝাপড়ায় কোনো ফাঁকি নেই। ফুলমণির কাছে দুর্লভের অনেক পাওয়া বাকি আছে; তা হল প্রফুল্ল। প্রফুল্লকে গ্রামের জমিদার পরান চৌধুরীর হাতে তুলে দিতে পারলে প্রচুর অর্থ লাভের সুযোগ মিলতে পারে। এমন সুযোগ হাত

ছাড়া করতে সে চায় না; যদিও এ কাজে স্বার্থপরতা, ইতরতা, অভদ্রতা, নোংরামি ইত্যাদি নানা অসৎ বৃত্তির প্রকাশ হোক না কেন। প্রফুল্লর নিশীথ রাতের একমাত্র শয্যাসঙ্গিনী ফুলমণি। ঘুমন্ত সরলা প্রফুল্লকে দুর্লভের পালকিতে তুলে দেবে ফুলমণি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফুলমণির মনোবাসনা পূর্ণ হয় না; প্রফুল্লর জীবনের গতি অন্য দিকে মোড় নেয়।

'নিমাইমণি' বঙ্কিম সৃষ্ট আর একটি চরিত্র; যার খুব স্বল্প আসা-যাওয়াতে পাঠক মনে স্থায়ী আসন সে লাভ করেছে। বয়স তার আঠার বছর, ভৈরবীপুর গ্রামে একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে স্বামীর সঙ্গে তার বাস; তাদের কোনো সন্তানাদি নেই। তবে গোরু-ছাগল-ময়ূর-ময়না-টিয়া, এবং ঢেকি, খামার, চরকা এইসব নিয়ে সারাদিন তাদের অতি ব্যস্ততায় দিন কাটে। এর মধ্যে হঠাৎ করে ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ নিমাইমণি একটি সন্তান মানুষ করার দায়িত্ব পেয়ে যায়। নদীর ধার থেকে মহেন্দ্রের শিশুকন্যা সুকুমারীকে উদ্ধার করে আনে ব্রহ্মচারী জীবানন্দ এবং কোন 'নিমি' অর্থাৎ 'নিমাইমণি'কে প্রতিপালনের ভার দেন। পরম মাতৃস্নেহে 'নিমাইমণি' কন্যা সন্তানটিকে মানুষ করে। শিশু সন্তানটিকে পেয়ে নিমাইমণির অন্তরবিগলিত বাক্য – "আমি মেয়েটাকে দুধ খাওয়াইব, কোলে করিব, মানুষ করিব – বলতে বলতে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে, আবার হাসে।" আসলে নারী জীবনের এ যেন পূর্ণতার এক স্তর। তবে এসবই ক্ষণিকের। অনেক কষ্টে বড় করে তোলা সন্তানকে একদিন ফিরিয়ে দিতে হয় তার বাবা-মা মহেন্দ্র-কল্যাণীর কাছে। সুকুমারীকে ছেড়ে নিমাইমণিকে বয়ে বেড়াতে হয় দুঃসহ দহন-জ্বালা। 'আনন্দমঠের' সুমহান জীবনাদর্শে দীক্ষিত ব্রহ্মচারী সন্তান দলের ভিড়ে বিস্মৃত প্রায় নিমাইমণি আপন তিতিক্ষায় সহনশীলতার দীপ্তিতে কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

চাঁপা, বাবার দেওয়া নাম চম্পকলতা; নিজের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, একাকিত্ব ও সর্বোপরি উপস্থিত বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় পাঠকের মনে স্থায়ী আসন করে নেয়। বড়োই হতভাগা নারী সে; শ্বশুর বাড়ি এসে তার নাম হল চাঁপা। নিয়তির নিষ্ঠুর অভিশাপে সে হল সন্তানহীনা। তার জীবনে নেমে এল চরম দুঃখ। তার স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন। গোপাল বসুর পিতা চাঁপার শ্বশুর হরনাথ বসু রামসদয়বাবুর বাড়ির সরকার। সেই বাড়ির ছোটবাবু শচীন্দ্রের প্রণয়প্রার্থী অন্ধ রজনী। ত্রিশ বছর বয়সী গোপালের লক্ষ্য রজনী; গোপালের সন্তান লাভের উপায় হবে সে। অন্যদিকে অসহায়, সম্পদহীনা চাঁপা, স্বামীর স্বপত্নী গ্রহণ তার দুঃসহ হয়ে পড়েছে। পুরুষ জাতির এহেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে সে। তবে চাঁপা নিরাবেগ বা নিরুদ্যম নয় – "সন্তানের জন্ম দিতে দিতে যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়" – তেমন স্থূলবুদ্ধি হয়ে থাকে না সে। চাঁপা খুব শক্ত চরিত্রের মেয়ে। তার চারিত্রিক দৃঢ়তায় তার কঠিন পথ চলার সহায় হয়। রজনীকে বিয়ে করার জন্য প্রথমে সে তার ভাই হীরালালকে টাকার লোভ দেখায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়; তারপর সে এ বিষয়টি নিয়ে পৌঁছে যায় সরাসরি রজনীর কাছে। চাঁপা খুব ঝাঁঝালো গলায় বলে – "হা দেখ, কানি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তবে যেদিন তুই ঘর করিতে যাইবি সেইদিন তোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।" আসলে সব নারী তার নিজের সংসারে অপ্রতিদ্বন্দী থাকতে চায়। পুরুষের গৃহধর্ম

পালনের সঙ্গী এক; আর সন্তান লাভের উপায় হবে অন্য এক পাত্রী এতো হয় না। অবিবেচক পুরুষের এরকম অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল চাঁপা যা শাশ্বত কালের নারীর প্রতিবাদে পরিণত হতে পেরেছিল। লেখক বঙ্কিমচন্দ্রেরও এই প্রতিবাদে পূর্ণ সমর্থন ছিল; বহু বিবাহের কুফলকে তিনি বার বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

কৃষ্ণদাস বসুর স্ত্রী বসুজপত্নী অত্যন্ত রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। হৃদয়হীনা, স্নেহহীনা, বসুজপত্নীর যাবতীয় উষ্মা সহ করেই ইন্দিরা তাদের সহযাত্রী হয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছায়। কৃষ্ণদাসবাবু যেমন সহৃদয় ব্যক্তি বসুজপত্নী তেমন তার বিপরীত ধরণের চরিত্র। সে সম্পন্ন ঘরের বধূ, রিক্ততা, জীর্ণতা তাকে স্পর্শ করেনি অথচ তার হৃদয় শুষ্ক ও কঠিন। গঙ্গাতীরে অমলা ও নির্মলার মল বাজানো গান তার কাছে শ্রুতিকটু মনে হয়। নিঃসঙ্গ ইন্দিরাকে বোনঝি সুভাষিণীর কাছে দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করতে তার বাধে না। এমনই চেতনাশূন্য বিবেকহীন, নিষ্করুণ বসুজপত্নী। তার ক্রিয়াকর্মের মধ্যেই তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য নিহিত।

সমগ্র উপন্যাসে একটি মাত্র পৃষ্ঠায় তারার মায়ের উপস্থিতি, প্রফুল্লকে তার শাশুড়ির কাছে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে। শ্বশুরবাড়ি থেকে পরিত্যক্তা অষ্টাদশী প্রফুল্ল যখন তার মায়ের সঙ্গে বাড়িতে ফিরে আসে, তখন গৃহিনী অর্থাৎ প্রফুল্লর শাশুড়ী কিছুতেই তাকে মনে করতে পারে না। এই অবস্থায় প্রফুল্লর মায়ের মান বাঁচাতে তারার মা বলে ওঠে, ''দুর্গাপুরের বেহান গো – তোমার বড় ছেলের শাশুড়ী।' এত ক্ষুদ্র অথচ কত গভীর ভূমিকা এই দাসীর ভাবা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের নারী ভাবনা এখানে নারী জীবনের আর এক ভূমিকাকে উন্মোচিত করে।

সীতারামের স্ত্রীর দাসী যমুনা। অসুস্থ রমাকে সেবাযত্ন করে এই দাসী যমুনা। সামাজিক ক্ষেত্রে তার অবস্থান নীচে কিন্তু মন তার অনেক উঁচু স্তরের। এক সময় দারিদ্র্য তাঁকে টেনে নামিয়ে আনে পঙ্কিলতার মধ্যে। মনে জমা হতে থাকে পাপ বোধ। সংসারের দারিদ্র্য তাকে অর্থে লোভে হিংস্র কুকুরের মতো সংসার সমুদ্রে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়; সমস্ত ন্যায়বোধ তার বিসর্জিত হয় পঙ্কিলতার পাপযজ্ঞে। অসুস্থ রমাকে কবিরাজের সমস্ত ওষুধ খাওয়াবার দায়িত্ব তার। কিন্তু রমা একেবারেই ওষুধ খেতে চায় না; ফলে যমুনার হাতে জমতে থকে প্রচুর ওষুধ। অর্থলাভের উপায় খুঁজতে থাকে যমুনার মন। সরলা রমার কাছে যমুনা অর্থের বিনিময়ে কবিরাজের দেওয়া ওষুধ বিক্রি করে অনেক টাকা জোগাড় করে নেন। এহেন নীচ মানসিকতার পরিচয় দেয় যমুনা। সে যে কতটা লোভী, ধূর্ত, শঠ ও প্রবঞ্চক তা বঙ্কিমচন্দ্র খুব সুন্দরভাবেই পরিস্ফুট করেছেন তাঁর ভাবনার তুলিতে।

গৃহস্থ কুলীন পরিবারের কুলীন পত্নী শ্যামাসুন্দরী। গার্হস্থ্য ধর্মই নারীর একমাত্র ধর্ম এবং গার্হস্থ্য জীবনই নারীর একমাত্র আবাসক্ষেত্র শ্যামাসুন্দরীকে দেখলে তাইই মনে হয়। কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের স্ত্রী রূপে অর্থাৎ ভ্রাতৃজায়া রূপে পেয়ে তাকে সুন্দর করে সে বধূ রূপে সাজিয়ে দিয়েছিল। কপালকুণ্ডলা একমাত্র তার কাছেই গৃহজীবনের স্বাদ পেয়েছিল। শ্যামাসুন্দরীর মতো নারীরা স্থবির গৃহজীবনকে আঁকড়ে ধরে রাখে। তাদের অন্য কোনো অবলম্বন থাকে না। অথচ কপালকুণ্ডলার প্রকৃতিই যেন আলাদা। নারীজীবনের নানা রূপ স্রষ্টা বঙ্কিমের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। দুই মেরুতে দুই নারীর অবস্থানগত ব্যবধানে পাঠকের

চোখেও ভিন্ন তাৎপর্য আভাসিত হয়। শ্যামাসুন্দরী তার স্বামীকে বশ করার জন্য বের হয় গভীর রাতের অন্ধকারে ওষধি আনবার জন্য। সে ব্যর্থ হলে পরের রাতে কপালকুণ্ডলা একাকী যায় সেই ওষধি আনতে। এখানেই তার জীবন হয়ে পড়ে ভিন্নমুখী। কপালকুণ্ডলার জীবনের ক্ষণিকের নদী হয়েছিল শ্যামাসুন্দরী।

নারী মোহিনী মায়ায় বাঁধতে জানে; নারী জাদু জানে। বিমলার প্রহরী রহিম শেখ; সে পাঠান সেনা। বিমলার র‍্যোমান্টিক প্রণয় সম্ভাষণে রহিম শেখ মুগ্ধ হয়। নানা কথার ছলনায় পুরুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা একমাত্র নারীই রাখে। বিমলা তার পাপ-স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করে রহিম শেখজির হাত ধরে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে। রহিম শেখ প্রেমের রজ্জুতে বাঁধা পড়ে নিজের কাজ ভুলে যায়। বিমলার কাছে এটাই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসে দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমাকে উদ্ধার করে নিজের কর্তব্য পালন করে বিমলা। বিমলার মধ্য দিয়ে প্রেমের ছলনার নানান ছবি বঙ্কিম তুলে ধরেন তাঁর ভাবনার স্কেচে।

ব্যক্তি মনের আলো-অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা গভীর মনের 'আঁতের কথা' বঙ্কিম তাঁর তুলির আঁচড়ে ভিন্ন ভিন্ন নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে শ্রাবণের ধারার মতো ঝরিয়ে দিয়েছেন পাঠক মনের অঙ্গনে। 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী-পাঠক' সেখান থেকে সংগ্রহ করেছেন 'নারী ভাবনার' নানান তথ্য; যা সমৃদ্ধ করবে আরো অনেক সৃষ্টিকে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

১। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় – বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।
২। ড. সুকুমার সেন – বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।
৩। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় – বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।
৪। গোপাল হালদার – বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা।
৫। প্রমথনাথ বিশী – বঙ্কিম সরণী।
৬। যোগেশ চন্দ্র বাগল (সম্পাদিত) – বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), সাহিত্যসমগ্র পৃ. ২৮২।
৭। মোহিতলাল মজুমদার – বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস।
৮। প্রমথনাথ বিশী – বাংলা সাহিত্যের নরনারী।
৯। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত – বঙ্কিমচন্দ্র।
১০। মাতৃশক্তি পত্রিকা – দ্বাদশবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।
১১। শনিবারের চিঠি (পূজো সংখ্যা ২০১২)।

বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষচর্চা

ড. বিজলি সরকার

বহুমুখি বিদ্যানুশীলনের এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্মতত্ত্ব-ন্যায়শাস্ত্র-আইনশাস্ত্র-চিকিৎসাবিদ্যা-জোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি কত বিষয়েই যে তিনি গভীর অধ্যয়ন করেছেন – তার নজির ছড়িয়ে আছে তাঁর সৃজনধারায়। একান্ত ছাত্রবয়স থেকে আমৃত্যু তাঁর এই অধ্যয়ন অব্যাহত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তাঁর মেজ্‌দাদা সঞ্জীবচন্দ্রও ছিলেন একজন অসামান্য অধ্যয়নপ্রিয় মানুষ। সঞ্জীবচন্দ্রের নাতি শতঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার'-এ (নৈহাটি কাঁঠালপাড়ায় অবস্থিত এই ঘরটি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের তৈরি বৈঠকখানা। এই ঘরেই ভারতের জাতীয় মন্ত্র বন্দেমাতরম্ লেখা হয়েছিল। লেখা হয়েছিল 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস সহ প্রচুর প্রবন্ধনিবন্ধ। বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার', 'ভ্রমর' পত্রিকার দপ্তর ছিল এই ঘরে। সাময়িকপত্রের ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বাঙালির চিন্তা-চেতনায় রূপান্তর ঘটিয়েছিল। একটি মাত্র পত্রিকা যে একটা জাতির জাতিগত পরিচয় নির্দিষ্ট করে দেয় তার এক মস্ত দৃষ্টান্ত 'বঙ্গদর্শন'। বাঙালি তার মধ্যযুগীয় দৈন্যদশা থেকে আধুনিকতার শীর্ষে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল 'বঙ্গদর্শন'-কে আশ্রয় করে। ১৯৯৯-এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভিটেয় বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে ঐতিহাসিক বৈঠকখানাটি এই প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত হয়) ১৯৫৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের, সঞ্জীবচন্দ্রের এবং পারিবারিক নানা স্মারক-দ্রব্য দান করেন। এইসব স্মারক-দ্রব্যের মধ্যে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সঙ্গে প্রচুর কাগজপত্র; যার মধ্যে রয়েছে অজস্র বই, চিঠিপত্র, ডায়রি, গানের খাতা, বিভিন্ন নোটস, রসিদপত্র ইত্যাদি। বঙ্কিম-ভবন গবেষণা

কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বঙ্কিম-সংক্রান্ত সমস্ত দুর্লভ নথিপত্র উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ল্যামিনেশন এবং ডিজিটাইজেশন করে আর্কাইভে সংরক্ষিত হয়েছে। সংরক্ষিত রসিদপত্রের মধ্যে আছে বিলেতি কোম্পানী থেকে কেনা প্রচুর বইয়ের রসিদ। মেসার্স অ্যালেন অ্যান্ড কোং, থ্যাকার্স স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোং নামে বইয়ের দোকান থেকে বঙ্কিম ও সঞ্জীব নিয়মিত বই কিনতেন। রসিদের তালিকায় চোখ রাখলে তার হদিস পাওয়া যায় এইসব রসিদে। দেশের ইতিহাস ও য়ুরোপীয় ইতিহাস পড়ার তাঁদের ঝোঁক ছিল সবচেয়ে বেশি। সঞ্জীবচন্দ্রের ডায়রি থেকে জানা যায়, তিনি এলফিনস্টোনের ভারত ইতিহাস, উইলিয়ম উইলসন হ্যান্ডারের ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার, ব্রিটিশ আমলের বিবরণ, ইন্ডিয়ান মুসলমান কত নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পড়েছেন। তিনি আবার নোট করে পড়তেন। 'মোছলমানের ইতিহাস' লেখার কথা তাঁর ডায়রিতে আছে (দ্র. সঞ্জীবচন্দ্রের ডায়রি, 'বঙ্গদর্শন' ৪ ও ৫, সম্পা: সত্যজিৎ চৌধুরী, বঙ্কিম-ভবন, নৈহাটি)। বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যয়নের কিছুটা হদিস দিয়েছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। (দ্র. 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ ২', সম্পা: সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)। বঙ্কিমচন্দ্রের অধীত বিদ্যার বিস্তার ছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জ্ঞানরাজ্যের নানা শাখায়। তিনি মনে করতেন, জ্ঞানের কোনো দেশ-কাল-সীমা নেই, নেই কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক বিদ্যানুশীলনের গণ্ডিকাটা ঘর। মানব-বিদ্যাচর্চার প্রতিটি বিষয়েই প্রকৃত জ্ঞানতপস্বীর তৃষ্ণা থাকা চাই। তবেই একজন খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ মানুষ পূর্ণমানব হয়ে উঠতে পারে। তাই তিনি স্পেশালাইজেশন বিদ্যাচর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন না। এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট অভিমত,

'আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক, কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক হইতে হইবে – সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞান-কুশলী, কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত; সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্যদত্তপ্রাণ, সর্বসৌন্দর্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ – সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন, সুতরাং ধর্মে পতিত।' ('ধর্মতত্ত্ব')

এই ভাবনা থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার বহুমুখি শাখায় তাঁর অনুপ্রবেশ। তিনি সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য, ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন ভাটপাড়ার বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে। যেমন, শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ, শ্রীরাম শিরোমণি, হলধর তর্কচূড়ামণি, তারাচরণ বিদ্যারত্ন, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, শিবচন্দ্র সার্বভৌম, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পঞ্চানন তর্করত্ন, চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, হৃষীকেশ শাস্ত্রী, হরিহর শাস্ত্রী প্রমুখ। এছাড়া উত্তরাধিক সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দাদামশায়ের নিজস্ব সংগ্রহের প্রচুর সংস্কৃত গ্রন্থ পেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মা দুর্গাসুন্দরী দেবী ছিলেন হুগলির বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণের মেয়ে। 'গীতগোবিন্দ' ও 'মহানির্বাণ তন্ত্র'-এর টীকাকার বিদ্যাভূষণের বাড়িতে

একটি বড়ো চতুষ্পাঠী ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটো ভাই পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন,

'আমাদের মাতামহ সেকালে সংস্কৃত শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু ব্যয়ে ও বহু যত্নে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি সেকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল, এখন ত বটেই। বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃতের দিকে বড় ঝোঁক দেখিয়া আমাদের মাতুল ঐ সমস্ত গ্রন্থ তাঁহাকে দিয়াছিলেন।' ('নারায়ণ', ভাদ্র, ১৩২২)

অন্যদিকে য়ুরোপীয় শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শন বিষয়ে তিনি স্কট-শেক্সপিয়ার-কোৎ-মিল-বেন্থাম-হেগেল-শ্লেগেল-বাক্‌লে-ইয়ঙ্‌-প্রক্টর-উইলিয়ম হর্শেল-টিণ্ডল-গ্লেশরদের পাঠ নিয়েছিলেন গভীরভাবে। য়ুরোপীয় আধুনিক বিদ্যা অনুশীলনের গরজে তিনি অন্যান্য বহু বিষয়ের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astrology) এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্র (Astronomy) বিষয়েও গভীর পড়াশুনো করেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর 'বিজ্ঞানরহস্য'-এর প্রবন্ধাবলিতে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বঙ্কিমের অধ্যয়নের ব্যাপ্তি বিস্ময়কর। এ বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন তাঁকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। যেসব বাঙালি পাঠক য়ুরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তেমন অনুশীলন করে উঠতে পারেন নি, তাঁদের উদ্দেশে বলেন,

'যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোর্তিবিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাঁহাদের বোধগম্য করার জন্য সূর্য্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক' (''আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত'')। 'বিজ্ঞানরহস্য'-এর প্রতিটি প্রবন্ধে বঙ্কিম শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে য়ুরোপের আধুনিক বিজ্ঞান-গবেষণায় উঠে আসা তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ ঘটান নি, সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব অভিমতও ব্যাখ্যা করেছেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, একজন সাহিত্যসাধক সৃজনপ্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব হয়েও তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো কঠিন দুরূহ বিষয় এমন গভীরভাবে আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন – যা মূলত একজন দক্ষ বিজ্ঞানবিদের পক্ষেই সম্ভব!

জ্যোতিষ-শাস্ত্র (Astrology) বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ছিল তরুণ বয়স থেকেই। বঙ্কিমচন্দ্রের দিদি নন্দরাণী দেবীর ছেলে কৈলাসচন্দ্র লিখেছেন,

'বরাহমিহির, খনা, এবং অন্যান্য গ্রন্থপাঠ এবং ইংরাজী Nepoleon, Laplace প্রভৃতির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তিনি জ্যোতিষে বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন। নিজেই সব পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিখিয়া ফেলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার সঙ্গে পড়েন।" (উদ্ধৃত গোপালচন্দ্র রায়, 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র', দেজ, ১৯৭৯, পৃ. ১১৩)।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু জ্যোতিষী গণনায় বিশ্বাসীই ছিলেন না, তিনি নিজেও গণনা করতেন। কৈলাসচন্দ্র জানাচ্ছেন,

'একদিন ভৃত্য সংবাদ দিল, তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের বাড়ির গাভীটি একটি কৃষ্ণবর্ণ বৎস প্রসব করিয়াছে। অমনি পঞ্জিকা খুলিয়া জন্ম-সময় ইত্যাদি দেখিয়া নিরূপণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মখু কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার গণনায় স্থির হইল, গৃহস্বামীর (সঞ্জীবের) খুবই অমঙ্গল

হইবে। অবশ্য কি অমঙ্গল হইবে, তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। অল্পদিন পরেই সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু হয়।' (আগের সূত্র)

জ্যোতিষ-গণনায় বঙ্কিমের বিশ্বাসের ছায়া পড়েছে তাঁর উপন্যাসেও। 'মৃণালিনী', 'সীতারাম' এবং 'যুগলাঙ্গুরীয়' – এই তিনটি উপন্যাসে জ্যোতিষ-গণনা প্রায় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষ করে 'সীতারাম' এবং 'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসের কাহিনী আনেকখানি নির্ভর করেছে জ্যোতিষী-গণনার ওপর। কখনো মাধবাচার্য ('মৃণালিনী'), কখনো আনন্দস্বামী ('যুগলাঙ্গুরীয়'), কখনো বা দৈবজ্ঞর ('সীতারাম') গণনার ওপর উপন্যাসের কাহিনীর গতিপ্রকৃতি নির্ভর করেছে। 'মৃণালিনী'-র নায়ক হেমচন্দ্রকে মাধবাচার্য বললেন, 'কয় মাস পর্যন্ত আমি কেবল গণনায় নিযুক্ত আছি, গণনায় যাহা ভবিষ্যৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা ফলিবার উপক্রম হইয়াছে" এবং 'গণনায় দেখিলাম যে, যবনসাম্রাজ্য-ধ্বংস বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে"। এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা মাধবাচার্যের গণনার নির্দেশ অনুসারে কাজ করেছে এবং উপন্যাসের উত্থান থেকে পরিণতি পর্যন্ত গণকই প্রধান নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেছে।

'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসেও মূল বিষয় জ্যোতিষীর গণনা। তাম্রলিপ্ত নগরের শ্রেষ্ঠী পুরন্দর ও শ্রেষ্ঠীকন্যা হিরন্ময়ীর বিয়ে না হওয়া বা হওয়া নির্ভর করেছে গুরুদেব আনন্দস্বামীর জ্যোতিষ-গণনার উপরে। আনন্দস্বামী পুরন্দর ও হিরন্ময়ীর উদ্দেশে লিখেছেন,

'জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ, তাহা কর্তব্য নহে। হিরন্ময়ীর তুল্য সোনার পুত্তলিকে কখন চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। তাহার বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ। তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চ বৎসর পর্যন্ত পরস্পরে যদি দম্পত্তি মুখদর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি হইতে পারে তাহার বিধান আমি করিতে পারি।" (যুগালাঙ্গুরীয় ৩৩৮)। আনন্দস্বামী 'পাত্রর কোষ্ঠী গণনা করিয়া জানিলেন যে, পাত্রটি অশীতি বৎসর বয়স অতীত হইবার পূর্বে মৃত্যুর এক সম্ভাবনা ছিল। গণিয়া দেখিলেন যে, ঐ বয়স অতীত হইবার পূর্বে এবং বিবাহের পঞ্চবৎসর মধ্যে স্ত্রীশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার প্রাণত্যাগ করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি কোনরূপ পঞ্চ বৎসর জীবিত থাকেন, তবে দীর্ঘজীবি হইবেন।"

পুরন্দর ও হিরন্ময়ীর পাঁচ বছরের জন্য বিচ্ছেদ এবং পরে মিলন – সবই ঘটেছে গুরুদেব আনন্দস্বামীর জ্যোতিষ-গণনার ওপর ভিত্তি করে।

'সীতারাম' উপন্যাসেও গুরুত্ব পেয়েছে দৈবজ্ঞের দৈবাদেশ। কেন বিয়ের এক মাস পরে সীতারাম তার স্ত্রী শ্রীকে পরিত্যাগ করেছিল – স্ত্রীর এই প্রশ্নে সীতারাম জানায়,

'তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্তা ঠিক হয়, তখন আমার পিতা তোমার কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিল না, কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়িতে

একজন দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমার পিতাঠাকুর বড় আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতাঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তুতকরণে নিযুক্ত করিলেন। দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া ... পড়িয়া পিতাঠাকুরকে শুনাইল; সেই দিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে। . . . তোমার কোষ্ঠীতে বলবান চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল। . . . যাহার এরূপ হয়, সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়। অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে। স্ত্রীলোকের 'প্রিয়' বলিলে স্বামীই বুঝায়। পতিবধ তোমার কোষ্ঠীর ফল বলিয়া তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।'

সীতারাম ও শ্রীর বিবাহিত জীবনে বিড়ম্বনা ঘটিয়েছিল দৈবজ্ঞর তৈরি কোষ্ঠীবিচার। কোষ্ঠীবিচারে বলা হয় সীতারামের স্ত্রী শ্রী প্রিয়-হন্ত্রী হবে। স্ত্রীলোকের প্রিয় তার স্বামী। তাই সীতারামের মৃত্যুর কারণ হবে তার স্ত্রী শ্রী। দৈবজ্ঞর নির্দেশে সীতারামের বাবা পুত্রবধূকে পরিত্যাগ করে, শ্রীকে তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কোন অপরাধে শ্রী শ্বশুরবাড়িতে পরিত্যাজ্যা হয়েছিল সেটা বাবার মৃত্যুর পরে সীতারাম শ্রীকে জানায়। এভাবেই বঙ্কিমের উপন্যাসে জ্যোতিষীর গণনার অমোঘ প্রভাব কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। জ্যোতিষীর গণনা অমোঘ ও অভ্রান্ত – এ বিশ্বাসই এই উপন্যাসগুলির মূল সুর।

ফলিত জ্যোতিষে বঙ্কিমের আগ্রহের কথা লিখেছেন 'বঙ্কিম-জীবনী'-কার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (শচীশচন্দ্র বঙ্কিচন্দ্রের বড়ো দাদা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে)। তিনি লিখেছেন, 'কলিকাতায় অবস্থানকালে মধ্য বয়সে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষী স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন তাঁহার শিক্ষাগুরু।' শচীশচন্দ্র আরও লেখেন,

'বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু হস্তাঙ্ক-গণনায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল বলিয়া মনে হয় না। একদা তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষীর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি বন্ধুসহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় সেক্ষেত্রে মুখাবয়ব দর্শন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতির গণনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া জ্যোতিষী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন, 'You succeeded to an extent which surprised me'।

'তার কিছুকাল পরে জ্যোতিষী মহাশয় আহূত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে আসিয়াছিলেন। সে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স সাতচল্লিশ বৎসর। জ্যোতিষী মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কয়েকটি অপরিচিত ভদ্রলোক তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এই অপরিচিত ভদ্রলোগদিগের পরিচয় তিনি পরে পাইয়াছিলেন। তাঁহার সকলেই খ্যাতনামা পুরুষ। অগ্রজ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র, অভিন্নহৃদয় বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার জমিদার বৈবাহিক বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

'এ ক্ষেত্রে জ্যোতিষী মহাশয় ললাট দেখিয়া গণনা করেন নাই – হস্তাঙ্ক দৃষ্টে গণনা করিয়াছিলেন। ফলাফল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন, –

'You (Jyotishi) were correct in what you said of me in regard to certain

matters which I am certain are not known to any one but myself.'

'I state what happend once must not be understood as having yet proved any dicided opinion on the subject of Palmistry. What I am convinced of is that you are possessed of either a science or certain powers of mind which I do not yet understand.'

'জ্যোতিষী গণনায় বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু তবু তাঁহার বিশ্বাস হইল না যে, হস্তরেখা দৃষ্টে ভাগ্য গণনা সম্ভবপর।'

১৮৯০-৯১ সাল নাগাদ কলকাতায় আর এক নামকরা জ্যোতিষীর সঙ্গে বঙ্কিমের আলাপচারিতার কথা লিখেছেন শচীশচন্দ্র। কলকাতায় এ সময় এক জ্যোতিষী এসেছিলেন। কলকাতার মাড়োয়াড়ি সমাজ এবং উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজে এই জ্যোতিষীকে নিয়ে বেশ হৈচৈ পড়ে যায়। এই জ্যোতিষীর বৈশিষ্ট্য ছিল, হাত বা কপাল গণনা নয়, তিনি যে কোনো ব্যক্তির মানসিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন। যেমন, কেউ কাগজে কোনো প্রশ্ন লিখে সেটা গোপনে হাতের মুঠোয় রেখে দিলে, তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর তাকে দিতেন। এমন চমকপ্রদ ক্ষমতা দেখবার জন্য তাঁর চারপাশে ভিড় লেগেই থাকত। এই ভিড়ে কলকাতার বহু খ্যাতিমান বিশিষ্টজনেরাও ছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে এই জ্যোতিষীর যাতায়াত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক (শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুরমশায়) দামোদর মুখোপাধ্যায় এঁর কাছে দীক্ষা নেন। জ্যোতিষীর ইচ্ছে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করবেন। দামোদর মুখোপাধ্যায় একদিন জ্যোতিষীকে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষীকে সমাদর করে ঘরে বসালেন। জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে কথার চেয়ে দেশবিদেশের আচার-রীতিনীতি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা হল। চলে যাবার সময় জ্যোতিষী কিছু একটা গণনা করে বঙ্কিমকে বললেন, তিনি যেন একটু সাবধানে থাকেন, পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে পারেন। বঙ্কিম হেসে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু পরের দিন বঙ্কিম ভাইপো শচীশচন্দ্রকে ডেকে বললেন, 'তুমি এখনই পণ্ডিতজীর নিকট যাও, তাঁহাকে বলগে তাঁহার গণনা সত্য হইয়াছে।' ('বঙ্কিম-জীবনী', সম্পাদনা: অলোক রায়, অশোক উপাধ্যায়, পুস্তক বিপণি, ১৩৯৫, পৃ. ২৭৫-২৭৭)

২

ব্যক্তিগত জ্যোতিষ-চর্চায় বঙ্কিমচন্দ্র কোষ্ঠী বিচারকে প্রাধান্য দিতেন বলে শোনা যায়। তিনি তাঁর মেয়েদের বিয়েতে কোষ্ঠী বিচার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তিন মেয়ে। বড় শরৎকুমারী, মেজো নীলাজকুমারী, আর ছোটো উৎপলকুমারী। বড় মেয়ের বিয়ে হয় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাখালচন্দ্র বঙ্কিমের কাছে ঘর-জামাই থাকতেন। নীলাজকুমারীর বিয়ে হয় উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার বাড়ির ছেলে সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আর ছোটো মেয়ের বিয়ে হয় কলকাতার বাঁশতলার এক ধনী

পরিবারের ছেলে মতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বড় ও মেজো জামাইকে নিয়ে বঙ্কিমের কোনো সমস্যা ছিল না। বড় ও মেজো মেয়ে দাম্পত্য-জীবনে সুখী হয়েছিলেন। কিন্তু ছোটো জামাই ছিলেন যেমন দুশ্চরিত্র তেমনি লোভী। উৎপলকুমারীর দাম্পত্য-জীবন অশান্তি আর যন্ত্রণায় ভরে গিয়েছিল। প্রবল দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের মর্মান্তিক শোকের কারণ হয়ে উঠেছিলেন এই ছোটো জামাই।

ছোটো মেয়ে উৎপলকুমারীকে বাবা মা আদর করে ডাকতেন পলা। পলার বিয়ের সময় বঙ্কিমচন্দ্র কোষ্ঠী মিলিয়ে ভালো করে সবদিক বিচার করে বিয়ে দিয়েছিলেন। কোষ্ঠীবিচারে দেখেছিলেন এই দম্পতি চিরসুখী হবে। তাই বালক বয়সে পিতৃহীন মতীন্দ্রর সঙ্গে ছোটো মেয়ের বিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি বঙ্কিম। কিন্তু বিয়ের পর পলার জীবনে নেমে আসে অশান্তি। মতীন্দ্রনাথ দিনরাত পড়ে থাকেন থিয়েটার পাড়ার নটিদের বাড়ি। পলার প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ বা ভালোবাসা ছিল না। ছোটোবেলায় বাবা মারা যাওয়ায় ঠাকুরদাদা একমাত্র নাতি মতীন্দ্রকে লাগামছাড়া প্রশ্রয় দিতেন। শাসন করতে পারতেন না। ফলে মতীন্দ্র কুসঙ্গে পড়ে একেবারে বখে গিয়েছিল। ক্রমে তাঁর চারিত্রিক স্খলন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁর কর্মস্থল মেদিনীপুরে রয়েছেন। পলা স্বামীকে নিয়ে বাবা-মার কাছে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে গেলেন। সেখানে এক প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে মতীন্দ্র তাঁর স্বভাবমতো অসভ্যতা করেন। ঘটনাটি জানতে পেরে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ জামাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। স্বামীর এ হেন অসভ্যতায় লজ্জা ও দুঃখে পলাও স্বামীর সঙ্গে মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। মতীন্দ্র শুধু চরিত্রহীন ছিলেন না, অত্যন্ত লোভী ছিলেন। পলা তাঁর বাবার সম্পত্তি কতটা পাবেন বা পাবেন না – এই নিয়ে মতীন্দ্রর হিসেব ছিল প্রখর। শ্বশুরমশায়ের (বঙ্কিমচন্দ্রের) কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর তিন মেয়ে আগেই বলা হয়েছে। বড় ও মেজো মেয়ের যথাক্রমে চারটি এবং তিনটি করে ছেলে ছিল। শরতকুমারী চার ছেলে ও স্বামী সহ বাবার কাছেই থাকতেন। মতীন্দ্রর কোনো সন্তান ছিল না। তাই তাঁর চিন্তা ছিল তিনি শ্বশুরমশায়ের সম্পত্তির ভাগ হয়তো পাবেন না।

কর্মসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যখন যেখানে বদলি হয়েছেন সঙ্গে নিয়ে যেতেন স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীকে। মেদিনীপুরে যাবার সময় রাজলক্ষ্মী দেবী ছোটো মেয়ে পলার কাছে তাঁর ১২ হাজার টাকা মূল্যের সোনার গহনা গচ্ছিত রেখে যান। মতীন্দ্র সেটা জানতে পেরে পলার কাছে ওই গহনা দাবি করেন। পলা মায়ের গহনা দিতে না চাইলে মতীন্দ্র যুক্তি দেখান, তাঁদের পুত্র সন্তান নেই, তাই সেজবাবুর (বঙ্কিমচন্দ্র) কিছুই তো তাঁরা পাবেন না। অতএব এই গহনা দিতে হবে। পলা গহনা দিতে রাজি হন না। গহনা না পেয়ে মতীন্দ্র স্ত্রীকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেন। পাড়ার বিনোদ ডাক্তারকে লোভ দেখিয়ে হাত করেন। পলার শরীরটা সেদিন ভালো ছিল না। দিনটি ছিল ৮ নভেম্বর, মঙ্গলবার, ১৮৮৭। মতীন্দ্র সেই সুযোগটা কাজে লাগালেন। তিনি বিনোদ ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এলেন পলার জন্য। সেই ওষুধে বিষ মিশিয়ে পলাকে খাইয়ে দিলেন। মৃত্যু আসন্ন বুঝে স্ত্রীর গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে

দিলেন। রটিয়ে দিলেন পলা আত্মহত্যা করেছেন।

পরদিন অর্থাৎ বুধবার বিকেল ৪টের সময় পুলিশ এসে পলার ঝুলন্ত মৃতদেহ কড়িকাঠ থেকে নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। পলার দেহ পুলিশ নিয়ে যাবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে পলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবরটা আসে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন মেদিনীপুরে ছিলেন। তাঁর কলকাতার বাড়িতে ছিলেন বড়োজামাই রাখালচন্দ্র। রাত ১১টার সময় রাখালচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে খবর পাঠান। এবং বলেন, সঞ্জীবচন্দ্র যেন পরিচারক বনকৃষ্টকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসেন, তাঁদের মেদিনীপুরে যেতে হবে। তিনি একা বঙ্কিমচন্দ্রকে সামলাতে পারবেন না। সঞ্জীবচন্দ্র ছুটে গেলেন মেদিনীপুরে। মর্মান্তিক খবরটা শুনে শোকে-দুঃখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন বঙ্কিম। রাজলক্ষ্মী দেবী আদরের ছোটো মেয়েটির এমন নিদারুণ মৃত্যুতে শোকে ভেঙে পড়লেন। বঙ্কিম বরং কিছুটা ধৈর্য্যের পরিচয় দিলেন। কারণ তিনি ছিলেন এক অসামান্য স্থিতধী পুরুষ। কয়েকদিন পর ছুটি নিয়ে তিনি কলকাতায় এলেন। গেলেন পলার শ্বশুরবাড়ি। মামলা করলেন। মেয়ের দাদাশ্বশুরের কাছ থেকে তাঁদের গচ্ছিত গহনা ফেরত নিলেন।

আত্মহত্যা নয়, পলাকে খুন করা হয়েছে – এ কথা জানান সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্রবধূ মোতিরাণী দেবী। সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র ছেলে জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মোতিরাণী দেবী। জ্যোতিশচন্দ্র এ সময় পুলিশ ইনস্‌পেকটরের চাকরিতে নদীয়ার মেহেরপুরে ছিলেন। মোতিরাণী স্বামীর কাছে পলার মৃত্যুর বর্ণনা করে দুটো চিঠি লিখেছিলেন। ৯ নভেম্বর, বুধবার (১৮৮৭ খৃ., কার্তিক ১২৯৪ বঙ্গাব্দ) তারিখে প্রথম চিঠিতে লেখেন,

'গত কল্য মঙ্গলবার রাত্র নয়টার সময় বাঁশতলার বাটিতে পলা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। সেই নিমিত্ত বুধবার রাত্র ১১টায় রাখাল বাবাকে বনকৃষ্টকে দিয়া লইতে পাঠাইয়াছিল। সে বলিয়া পাঠায় যে, আমি একলা সেজবাবুকে সামলাইতে পারিব না। পলা মতিন্দ্রর জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সে পিতা মাতাকে পত্র লিখিয়া মরে। ঐ পত্র পুলিসে লইয়া যায়। এক্ষণে ঐ পত্র সেজকাকার নিকট পাঠাইয়াছে। যদ্যপি সেজকাকা পত্র দেখিয়া বলেন যে, যথার্থই পলার হস্তের লেখা – তাহা হইলে সমস্তই ধরা যাইবে। আর যদ্যপি তিনি বলেন – ইহা পলার লেখা নয়, তাহা হইলে মতিন্দ্রর কি হইবে বলা যায় না। মঙ্গলবারে রাত্র ৯টার সময় মরে, বুধবারে বেলা ৪টার সময় তাহার (দেহ) ... নামানো হয়। এ পর্য্যন্তও পুলিস আসিয়া তাহাদের বাটিতে ত্বদারক করিয়াছে। সেজ খুড়ির ১২ হাজার টাকার গহনা পলার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন। বাবা আসিয়া ঐ গহনা আনিতে উহাদের ... বাটিতে যান। পরে ঐ সকল গহনা বলাই দত্তর নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন। অদ্য সেজ খুড়ির মাকে হালিসহর হইতে আনাইয়া ঐ সকল গহনা প্রভৃতি মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন।' (মোতিরাণীর চিঠি, মূল চিঠি আর্কাইভ, বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, নৈহাটি)।

৩

জ্যোতিষচন্দ্রকে দ্বিতীয় চিঠিটি লেখেন ১৩ই কার্তিক, (১২৯৪ বঙ্গাব্দ)। এই চিঠিতে মোতিরাণী পলার খুন হবার বিস্তৃত বর্ণনা করেন,

'সেজকাকা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পলার মৃত্যু কি রূপে হইয়াছে জনিতে তিনি শুক্রবারে গিয়াছেন। ঐ দিন বাবা বাড়ি আসিয়াছেন। সেজ কাকা আবার শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছেন। তিনি ছয় মাসের ছুটি লইয়াছেন। ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে। পলা গলায় দড়ি দিয়া মরে নাই। সে মরার পর ডাক্তার সাহেব আসিয়া তাহাকে কাটিয়া দেখিয়াছিল। তাহার পর, উহার পেটের নাড়ি ও মাথার খুলি কাটিয়া হাসপাতালে লইয়া যায়। তাহাতে ধরা পড়ে যে, সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। বিষ কি রূপে খাইল, কে আনিয়া দিল – তদারক হয়। তাহাতে ধার্য্য হইয়াছে যে, উহাদের বাটির নিকট কে বিনদ ডাক্তার আছে, তাহার কাছ হইতে মতিন্দ্র বিষ লইয়া যায়। পরে ঔষধ বলিয়া পলাকে খাওয়াইয়া দেয়। পরে যখন দেখিল তাহার মৃত্যু উপস্থিত, তখন, ঐ বৃন্দাবনের কাপড় গলায় বাঁধিয়া টাঙ্গাইয়া দেয়। সেজ খুড়ির ১২ হাজার টাকার গহনা যাহা পলার নিকট রাখিয়া যান, ঐ সকল গহনা মতিন্দ্র পলার নিকট হইতে চাহিত। সে তাহা দেয় নাই, তজ্জ্যন্ন মতিন্দ্র বলিয়াছিল যে, আমার পুত্র হয় নাই, আমি তো সেজ বাবুর কিছুই পাইব না – অতএব ঐ সকল গহনা আমাকে দাও। পরে সে পলাকে গহনা দিতে নারাজ দেখিয়া ঐ বন্ধুর চাতুরিতায় পরে পলাকে বিষ খাওয়ায়। পলা ও মতিন্দ্র মেদিনীপুর যাবার পরে মতিন্দ্র সেখানে উঁহাদের বাসার নিকট গৃহস্থে বাড়ি কুচরিত্র দেখায়। ঐ জন্য সেজ কাকা উহাকে বাসা হইতে বাহির করিয়া দেন। ঐ সঙ্গে পলাও চলিয়া আসে।' (আগের সূত্র)

বঙ্কিমচন্দ্রের করা মামলাটি ওঠে কলকাতার করোনার কোর্টে। এই মামলার জন্য বঙ্কিম বেশ কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। তবে মামলার বিচারের রায়ের দিন বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্যজনকভাবে এজলাসে নীরব ছিলেন। তিনি খুনি জামাইয়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। বঙ্কিম-জীবনীকার গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র মতীন্দ্রর বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার বিশেষ আবেদনে শেষ পর্যন্ত জামাইকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন। বঙ্কিমের নীরবতায় আদালতে পলার আত্মহত্যা সাব্যস্ত হয়। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, নিরপেক্ষ বিচারক হিসেবে সুখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র নিজের আত্মজার খুনি অপরাধীকে মাপ করে দিলেন, তাঁকে শাস্তি দিতে পিছিয়ে গেলেন – এ বড়ো আশ্চর্য লাগে! পিতৃহীন মতীন্দ্রর বৃদ্ধ ঠাকুরদার আবেদনে শেষ পর্যন্ত পাষণ্ড জামাইকে ক্ষমাই করে দিলেন!

ছোটো মেয়ের দাম্পত্য জীবনের করুণ পরিণতি দেখে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষ-গণনার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। তিনি নিজে কোষ্ঠী বিচার করে এই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। গভীর খেদে ভাইপো জ্যোতিশচন্দ্রকে লেখেন,

'জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিবে না। আমি উহার অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এক্ষণে উহাতে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছি।' (হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র')

৪

জ্যোতির্বিজ্ঞান আর জ্যোতিষী-গণনা এক বিষয় নয় বলাই বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো হাই রেনেসাঁসের অগ্রদূত, একজন আধুনিক বাঙালি শ্রেষ্ঠ মনস্বী, অসামান্য যুক্তিবাদী মানুষ জ্যোতিষী-গণনা বা কোষ্ঠীবিচারে বিশ্বাসী ছিলেন – ভাবতে অবাক লাগে। যদিও তিক্ত অভিজ্ঞতায় পরে সে বিশ্বাস ত্যাগও করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ, ভারতের জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা, বন্দেমাতরম্-এর স্রষ্টা, 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের মনন-জগতের এই দোটানা আমাদের বিস্মিত করে। এই দ্বিমুখি মানসিকতার তেমন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আজও অপেক্ষিত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালে এর উত্তর হয়তো কিছুটা মিলতে পারে। আমরা জানি কাঁটালপাড়ার বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় পরিবারটি ছিল গোঁড়া হিন্দু এক অতি রক্ষণশীল পরিবার। বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা যাদবচন্দ্র ছিলেন একান্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ। সে যুগের একজন দাপুটে ডেপুটি কালেক্টর, রায়বাহাদুর হয়েও সনাতন হিন্দুধর্মের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। কথিত দূর অতীতে এ বাড়িতে দুজন গৃহবধূ 'সতী' হয়েছিলেন (রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী আনন্দময়ী দেবী এবং পদ্মলোচনের স্ত্রী পদ্মাবতী)। পারিবারিক ঐতিহ্যানুসারে যাদবচন্দ্রের বাড়িতে বছরভর পালপার্বণ, পুজোপাঠের আয়োজন হত। বাড়িতে ছিল প্রাচীন গৃহদেবতা রাধাবল্লভের বিগ্রহ। এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করে চলত নানা এলাহি উৎসব। যেমন, রাস, গোষ্ঠযাত্রা, রথ, রথের মেলা, জন্মাষ্টমী, রামায়ণপাঠ, ভাগবতপাঠ, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙালভোজন ইত্যাদি। এছাড়া তো ছিল জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গাপূজা। রাধাবল্লভের সেবার জন্য ছিল নানা জায়গায় দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি। জমিজিরেতের আয় কমে গেলেও পালপার্বণের খরচ বৃদ্ধি পেত বছর বছর। এর জন্য যাদবচন্দ্রকে প্রচুর টাকা ঋণ করতে হত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার – প্রমুখ বহু বিখ্যাত মনস্বীর স্মৃতিচারণায় বঙ্কিমচন্দ্রদের বাড়ির পালপার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা জানা যাবে। রক্ষণশীল এই পরিবারে কুলপ্রথা কঠোরভাবে মানা হত। বাল্যবিবাহ, গৌরীদান, মেয়েদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে অন্তঃপুর শিক্ষা – পারিবারিক এই রীতি বঙ্কিমচন্দ্রও মেনে চলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে তাঁর বাবার প্রভাব ছিল গভীর। বঙ্কিমের উপন্যাসে সন্ন্যাসীর অতি প্রাদুর্ভাব, সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎবাণীর প্রতি বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছিল সম্ভবত তাঁর বাবার কাছ থেকেই। এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় একবার বন্ধুপ্রতিম শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

'আপনার পিতার সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর গল্প সঞ্জীববাবুর কাছে শুনিয়াছি। হইতে পারে তার দরুণ শৈশবাবধি মনে একটা impression আছে।' এই প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিম বলেছিলেন, 'সে গল্প শুনিয়াছি বটে, কিন্তু সে জন্য কিছু হইয়াছে বলিয়া আমার বোধ হয় না। তবে অনেক স্থানে অনেক সন্ন্যাসী দেখিয়াছি।' ('বঙ্কিমপ্রসঙ্গ', সম্পা: সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, নবপত্র, ১৯৮২)

যাদবচন্দ্রের সন্ন্যাসী সংক্রান্ত গল্পটি বেশ চমকদার। যাদবচন্দ্র নিজেই গল্পটি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন। বিশিষ্ট বঙ্কিম গবেষক শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর

'বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী'-তে লিখেছেন, আত্মজীবনীটি যাদবচন্দ্র স্বহস্তে লিখেছেন। এটা একেবারেই ঠিক নয়। যাদবচন্দ্র স্বহস্তে কোনো জীবনী লেখেন নি। বাবার কাছ থেকে শুনে তাঁর বড়ো ছেলে শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় অতি সংক্ষিপ্ত জীবনীটি লিখেছেন। (দ্র. 'বঙ্কিম-জীবনী', প্রাসঙ্গিক তথ্য, আগের সূত্র, পৃ. ৩৯৫) আঠার বছর বয়সে যাদবচন্দ্রের কানে একটি ফোঁড়া হয়েছিল। ক্রমে ফোঁড়াটি বিষিয়ে সেপটিক হয়ে যায়। মৃত্যুর সব চিহ্নই ফুটে ওঠে তাঁর শরীরে। মারা গিয়েছেন ভেবে বাড়ির লোক তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যান দাহ করতে। হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হন এক সন্ন্যাসী। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যাদবচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এ ব্যক্তি মরে নাই – এক্ষণে মরিবেও না।' (গোপালচন্দ্র রায়, আগের সূত্র)

সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, কিছুক্ষণের মধ্যে যাদবচন্দ্র চেতনা পেয়ে উঠে বসলেন। পরে যাদবচন্দ্র এই সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র-দীক্ষা নেন। এবং সন্ন্যাসী তাঁকে বলেন, যাদবচন্দ্রের জীবনে তিনি তিনবার দেখা দেবেন। একবার মধ্যবয়সে – বিদেশে, দ্বিতীয়বার মৃত্যুর "অষ্টাহপূর্ব্বে" আর তৃতীয়বার মৃত্যুর সময়। যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হয় ৮৭ বছর বয়সে। (১৩ মাঘ, ১২৮৭, ২৫ জানুয়ারি ১৮৮১)। "পিতার মৃত্যু" অংশে বঙ্কিমজীবনীকার শচীশচন্দ্র বিস্তারিত লিখেছেন কেমন করে যাদবচন্দ্রের মৃত্যুক্ষণে নৈহাটির গঙ্গার ঘাটে (যাদবচন্দ্রকে অন্তর্জলি যাত্রা করানো হয়েছিল) পূর্ব নির্দিষ্ট সেই সন্ন্যাসীর অলৌকিক দর্শন হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটোভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিশোর বয়সে উড়িষ্যার জাজপুরে যাদবচন্দ্রের জীবন-সংকটের সময় সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের গল্পের একটু ভিন্ন বর্ণনা করেছেন। তাঁর গল্পে অনেকটা লৌকিক ও বিজ্ঞানের ছোঁওয়া আছে। তিনি বলেছেন সন্ন্যাসী 'মস্তক হইতে নাভি পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ দুই হস্ত চালনা করাতেই পিতাঠাকুর পাশমোড়া দিলেন। ক্রমে ঐরূপ করিতে করিতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলেন। পরে কিছু দুগ্ধ পান করাইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাকে বাসায় আনা হইল।' ('বঙ্কিমপ্রসঙ্গ', আগের সূত্র) মৃত্যুর সময় যাদবচন্দ্রের কাছে তাঁর গুরুদেবের উপস্থিতির ব্যাপারে পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন, 'গুরুদেব যে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুশয্যায় প্রলাপে ব্যক্ত হইয়াছিল।' (আগের সূত্র) পূর্ণচন্দ্রের বর্ণিত সন্ন্যাসীর অন্যান্য ঘটনাগুলিও কিছুটা বাস্তব ঘেঁষা হলেও প্রচ্ছন্ন থাকে দৈবী শক্তির ইঙ্গিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেও এমন এক রহস্যময় সন্ন্যাসীর গল্প আছে। সেই গল্পটি তাঁর বাবার জীবনের থেকে কিছু কম চমকপ্রদ নয়। বঙ্কিম-জীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কথিত বয়ান অনুযায়ী সন্ন্যাসীর ঘটনাটি ঘটেছিল বঙ্কিমের জীবনের একেবারে শেষদিকে। বঙ্কিমের কলকাতার বাড়িতে একদিন এক সন্ন্যাসী গিয়ে বঙ্কিমকে বলেন, তিনি তাঁর গুরুর নির্দেশে বঙ্কিমের কাছে এসেছেন। গুরু থাকেন নেপালে। গত জন্মে বঙ্কিম এবং তিনি (উপস্থিত সন্ন্যাসী) ওই গুরুর শিষ্য ছিলেন। বঙ্কিম ও তিনি একই সঙ্গে যোগ সাধনা করেছিলেন। কর্মফলের কারণে বঙ্কিমের নিয়তি তাঁকে সংসারে টেনে আনে আর সন্ন্যাসী যোগী হয়ে আবার আগের জন্মের গুরুকে পেয়েছেন। বঙ্কিম সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরুদেব আপনাকে পাঠাইয়াছেন কেন?' সন্ন্যাসী বললেন সে কথা আর একদিন বলবেন। তারপর বঙ্কিমের হাতে

একটি রুদ্রাক্ষের মালা দিয়ে বলেন, যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন প্রত্যহ যেন বঙ্কিমএই মালাটিকে পুজো করেন। এই বলে সন্ন্যাসী চলে গেলেন। তারপর তিন মাস পরে আবার এলেন। সোজা উঠে গেলেন বঙ্কিমের দোতলার ঘরে। কিছু কথার পর সন্ন্যাসী বললেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র, এ দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে, তা কি বিস্মৃত হয়েছ?' বঙ্কিমচন্দ্র জানালেন, না, তিনি বিস্মৃত হননি। 'তবে প্রস্তুত হও'। সন্ন্যাসীর এই কথায় ঘরে সেসময় উপস্থিত বড়ো দৌহিত্রকে (শরৎকুমারীর বড়ো ছেলে দিব্যেন্দুসুন্দর) বঙ্কিম ঘর থেকে চলে যেতে বললেন। এরপর দরজা বন্ধ করে দীর্ঘক্ষণ, প্রায় পাঁচ-ছয় ঘন্টা দুজনের কথা হয়। সন্ন্যাসী চলে গেলে তাঁদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল তা বঙ্কিম কাউকে বলেন নি। শুধু স্ত্রীর জিজ্ঞাসায় বলেছিলেন, 'এতক্ষণ রমণ-পাষ্টি শিখিতেছিলাম।' 'রমণ-পাষ্টি'-র গুঢ়ার্থ বঙ্কিমের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীর বোধগম্য হয়নি। তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন, তাই এ বিষয়ে আর দ্বিতীয়বার স্বামীকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি।

ছোটো মেয়ে উৎপলকুমারীর মর্মান্তিক মৃত্যু বঙ্কিমচন্দ্রকে জ্যোতিষ-গণনার প্রতি অবিশ্বাসী করে তোলে। আত্মজার করুণ পরিণতি তাঁর মর্মে কতটা আঘাত করেছিল বোঝা যায়, যখন দেখি তিনি ভাইপো জ্যোতিশচন্দ্রকে চিঠিতে লেখেন,

'জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিবে না। আমি উহার অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এক্ষণে উহাতে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছি।'

বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণত যুক্তিবুদ্ধির আলোয় সবকিছু বিচার করতে, ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি কতটা আধুনিক দৃষ্টির মানুষ ছিলেন বোঝা যায় একটি ঘটনায়। একসময় সমুদ্রযাত্রা নিয়ে দেশে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। য়ুরোপে যেতে গেলে সমুদ্র পার হতে হবে। হিন্দু শাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ – এই যুক্তিতে গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের পক্ষে বিপক্ষে সেসময় বহু বিখ্যাত লোক জড়িয়ে পড়েন। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রকেও মতামত দিতে হয়। সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মত জানতে চান রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব। বঙ্কিমচন্দ্র বিনয়কৃষ্ণকে লেখা চিঠিতে লিখিতভাবে তাঁর মত জানান। এই চিঠিতে তিনি যা লেখেন তাতে তাঁর অসামান্য যুক্তিবাদী মনের পরিচয় মেলে। এই চিঠিতে তিনি স্পষ্টতই বলেন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, ধর্মের নামে, দেশাচার লোকাচারের নামে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করা উচিত নয়। কারণ,

'... শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ-সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম এবং এখনও পর্যন্ত সে মত পরিবর্তন করার কোন কারণ আমি দেখি না। আমার এরূপ বিবেচনা করিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম এই যে, বাঙ্গালী-সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে – দেশাচার আর লোকাচার বশীভূত। সত্য বটে যে অনেক সময় লোকাচার শাস্ত্রানুযায়ী, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যেখানে লোকাচার ও শাস্ত্রে বিরোধ সেইখানে লোকাচারই প্রবল।

'উপরি-উক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সর্ব্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কি না সন্দেহ। আপনারা সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া সমাজকে তদনুসারে চলিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু সকল বিষয়েই কি সমাজকে শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন? ধর্মশাস্ত্রের একটা বিধি এই, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। বাঙ্গালার শুদ্রেরা কি সেই ধর্ম্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে সাহসী হয়েন কি? চেষ্টা করিলেও এ ব্যবস্থা চালান যায় কি? হাইকোর্টের শূদ্র জজ জাজিয়তি ছাড়িয়া বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া ধর্মশাস্ত্রের গৌরবার্থ লুচি-ভজা ব্রাহ্মণের পদসেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না। বাঙ্গালি-সমাজ প্রয়োজন মতে ধর্মশাস্ত্রের কিয়দংশ মানে; প্রয়োজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেক কাল বিসর্জ্জন দিয়াছে। এবং সেইরূপ প্রয়োজন বুঝিলে অবশিষ্টাংশ বিসর্জ্জন দিবে। এমন স্থলে ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিয়া কি ফল? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং নীতিসম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religious and Moral Regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্তন করা যায় না।' (শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-জীবনী', আগের সূত্র)

দীর্ঘ চিঠির শেষে বঙ্কিম সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানান, 'সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত।" (আগের সূত্র)

একেই বুঝি বলে মনীষার আধুনিক চরিত্র! একদা সাময়িকভাবে হলেও জ্যোতিষ-গণনা, হস্তাঙ্ক-গণনায় বিশ্বাসী ছিলেন বঙ্কিম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলেন তাঁর যুক্তি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আর প্রজ্ঞার আলোয়। এখানেই সাহিত্যসম্রাটের ব্যক্তিত্বের প্রাতিস্বিকতা।

সমুদ্ধার

পত্রসূচনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯ প্রারম্ভিক সংখ্যা থেকে সমাহৃত)

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দূরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদের রচনাপাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির-জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালা ভাষার লেখকমাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য; নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুল জবাব কেন দিব?

ইংরাজিভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের "ভাষায়" যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা "বিষয়ী লোক", তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ পৌরকন্যা, এবং কোন নিষ্কর্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই-একজন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না।

পত্রসূচনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯ প্রারম্ভিক সংখ্যা থেকে সমাহৃত)

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দূরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদের রচনাপাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির-জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালা ভাষার লেখকমাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য; নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুল জবাব কেন দিব?

ইংরাজিভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের "ভাষায়" যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা "বিষয়ী লোক", তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ পৌরকন্যা, এবং কোন নিষ্কর্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই-একজন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না।

বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য, মিটিং, লেকচর, এড্রেস, প্রোসিডিংস সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়; কখন ষোলো আনা, কখন বারো আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্রলেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখনও দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদিও ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

ইহাতে কিছু বিস্ময়ের নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালিরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মানমর্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মানমর্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না-থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, তাহা অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত।

আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতা ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গলজন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলি কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইলে সেই সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালির জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত; সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীর নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগ না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এই একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়, কেননা এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। যত দূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, তত দূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালি কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালি হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি পড়ি, বা যত ইংরাজি কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টী পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালি স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচন ভঙ্গিমা হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালির

উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত না করিতে পারে? যদি কেহ এমন মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিন্ কালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না; ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না, যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন "ফিলটর ডৌন" করিবে। এ কথার তাৎপর্য এই যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগের পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালি জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে, ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য! এত কাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা দেশ উচ্ছন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেননা তাঁহাদের ছিদ্রগুণে ইতরলোক পর্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। ভরসা করি, বোর্ডের মনি সাহেব এবারকার আবকারি রিপোর্ট লিখিবার সময় এই জলপানা কথাটা মনে রাখিবেন।

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মুর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?

প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণী লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মুর্খ দারিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মুর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চশ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে পৃথক, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার

করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইল। বরং, যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজের, উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তাসম্পন্ন। যত দিন এই ভাব ঘটে নাই – যত দিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, তত দিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধির আরম্ভ। রোম, এথেন্স, ইংলন্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সমাজমধ্যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স এবং স্পার্টা দুই প্রতিযোগিনী নগরী; এথেন্সে সমান সমান; স্পার্টায় একজাতি প্রভু, একজাতি দাস ছিল। এথেন্স হইতে পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল – যে বিদ্যাপ্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এথেন্স তাহার প্রসূতা। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্যহেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজপীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। হস্তপদাদি ছেদ করিয়া, যেরূপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেরূপ সামাজিক মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশরদেশে সাধারণের সহিত ধর্মযাজকদিগের পার্থক্যহেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চবর্ণে এবং নীচবর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এমত কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্ঠও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের, অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যতর বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের অভিপ্রায় সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালি তাঁহাদিগের মর্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না। আর পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ; লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গালি তাঁহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাঁহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া থাকে।

যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য, তাহা আমরা সবিস্তারে বিবরিত করিলাম। কিন্তু রচনাকালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করার একটি বিশেষ বিঘ্ন আছে। সুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না।

অপরিতোষদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।

আমরা সকলেই স্বার্থাভিলাষী, লেখকমাত্রেই যশের অভিলাষী। যশ সুশিক্ষিতের মুখে। অন্যে সদসদ্‌বিচারক্ষম নহে; তাহাদের নিকট যশ হইলে তাহাতে লিপি পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। সুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে না।

এদিকে, কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "মহাশয়, আপনি বাঙ্গালি, বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন?" তিনি উত্তর করেন, "কোন্ বাঙ্গালা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।" আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই। যে কয়খানি বাঙ্গালা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই-তিনদিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যায়। তাহার পর দুই-তিন বৎসর বসিয়া না থাকিলে আর-একখানি পাঠ্য বাঙ্গালা রচনা পাওয়া যায় না।

এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালির অনাদরেই, বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বাঙ্গালা রচনাপাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এইমাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালি সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্তাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব নিবারণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থনজন্য বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থে যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতাসাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন সংকল্প না করিতাম, তবে এই পত্রপ্রকাশ বৃথা কার্য বিবেচনা করিতাম।

অনেকে বিবেচনা করেন যে বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম; তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ রাখিব।

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সংবর্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব, বাসনা করি। কিন্তু

যত গর্জে তত বর্ষে না। গর্জনকারী মাত্রেরই পক্ষে একথা সত্য। বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের পক্ষে বিশেষ। আমরা যে এই কথার সভ্যতার একটি নুতন উদাহরণস্বরূপ হইব না, এমত বলি না। আমাদিগের পূর্বতনেরা এইরূপ এক-এক বার অকালগর্জন করিয়া, কালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এইসকল পত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এইসকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিমাণ ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্‌বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতের নিয়মাধীন জলবুদ্‌বুদস্বরূপ ভাসিল; নিয়ম বলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্‌বুদ্‌ও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।

বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮২ সংখ্যা থেকে সমাহৃত)

চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম, কতকগুলি অব্যক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অব্যক্ত ছিল এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

যখন বঙ্গদর্শন-প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব আর্য্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত, এবং বঙ্গদর্শনের জন্য আমি যে শ্রমস্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ-পূর্বক, আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

* * * *

এ সংবাদে কেহ সন্তুষ্ট, কেহ ক্ষুদ্ধ হইতে পারেন। কেহ ক্ষুদ্ধ হইতে পারেন, এ কথা বলায় আত্মশ্লাঘার বিষয় কিছুই নাই। কেননা, এমত ব্যক্তি বা এমন বস্তু জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ না কেহ অনুরক্ত নহেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন যে, বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে, যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সংকল্প করি নাই যে, যত দিন বাঁচিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রতবিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী; এই

অল্পকাল মধ্যে সকলকেই অনেকগুলি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়; এজন্য কোন একটিতে কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহসংসারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে যে তাহাতে এই জীবন মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার নহে, এবং আমিও তাদৃশ ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্য পাত্র নহি।

যাঁহারা বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন, তাঁহাদের প্রতিই আমার এই নিবেদন। আর যাঁহারা ইহাতে আহ্লাদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সংবাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।

* * * *

বঙ্গদর্শন সম্পাদনকালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞতাস্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য।

প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনের প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি একদিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এত দিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কিনা সন্দেহ। এ বৎসর বঙ্গদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ যত্ন করি নাই, এবং সন ১২৮২ সনের বঙ্গদর্শন পূর্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই, তথাপি পাঠকশ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা দেখি নাই। ইহার জন্য আমি বঙ্গীয় পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তৎপরে, যেসকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এক আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোদনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়* প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।

আর-একজন আমার সহায় ছিলেন – সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ-দুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নাম-উল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে?

---

* বাহুল্যভয়ে সকলের নাম লিখিত হইল না। বিশেষ আমার ভ্রাতৃদ্বয়, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অথবা ভ্রাতৃবৎ বন্ধু বাবু জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাগাড়ম্বর মাত্র। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না।

* * * *

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটি স্পর্ধার কথা আছে। উচ্চশ্রেণীর দেশী সংবাদপত্রমাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন; অধিকতর স্পর্ধার কথা এই যে নিম্নশ্রেণীর সংবাদপত্রমাত্রই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। ইংরেজরা বাংলা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না; কিন্তু এক্ষণে গতাসু ইণ্ডিয়ান অবজর্বর বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান অবজর্বর এবং ইণ্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এরূপ আর কোন ইংরেজি পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবজর্বর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মিরর অদ্যাপি উন্নতভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবং ঈশ্বরেচ্ছায় বহুকাল তদ্রূপ মঙ্গল সাধন করিবেন; তাঁহাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ। বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতেও তিনি যে এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশপূর্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাঁহার উদারতার সামান্য পরিচয় নহে।

সহৃদয়তা এবং বল আমি কেবল অবজর্বর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি, এমত নহে। দেশী সংবাদপত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু পেট্রিয়ট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দেশ-বৎসল সহচরের দ্বারা আমি তদ্রূপ উপকৃত, এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সদ্বিদ্বান এবং যথার্থবাদী ভারতসংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট, ও তেজস্বিনী তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আনুকূল্যের জন্য, আমি শত শত ধন্যবাদ করি।

চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্‌বুদ্‌ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্‌বুদ্‌ জলে মিশাইল।

বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পৌষ, ১২৮৫ সংখ্যা থেকে আহরিত)

ইস্কুল ছাড়িয়া কলেজে ঢুকিবামাত্র ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত তিন ভাষার রাশি রাশি সাহিত্য বঙ্গীয় যুবকের সম্মুখে বিস্তারিত হইল। চসার, স্পেনসার, শেকসপীয়র, মিল্টন, ড্রাইডেন, পোপ, শেলি, বায়রন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন; কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, নৈষধ, ভট্টী; বাল্মীকি, বেদব্যাস, বেদপুরাণ, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবি; এডিসন, গোল্ডস্মিথ, স্কট, লিটন, ডিকুইন্সি, থ্যাকারে; দণ্ডী, বাণভট্ট, বিষ্ণুশর্মা; হুতোম, দীনবন্ধু, বঙ্কিম; প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থে তাঁহার প্রবেশ অধিকার হইল। দিনকত তিনি এই অগাধ সাহিত্যকাননে যদৃচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন কিন্তু যতই যান কাননের শেষ নাই, সকল বৃক্ষই সুমিষ্ট সকলেই আনন্দিত। যুবক হৃদয় – সংসারের ভাবনা নাই। জগতের সৌন্দর্য মাত্র তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত। হৃদয়ের বৃত্তি-সকল এখনো বিকৃত হয় নাই– এখনো পাকিয়া শক্ত হয় নাই। তিনি ক্রমে সকল প্রকার সাহিত্যেরই আস্বাদ গ্রহণ করিলেন কিন্তু এই অগাধ সমুদ্রমধ্যে তিন জন লোকই তাঁহার অধিকতর প্রিয় হইল। এই তিন জনই তাঁহার চরিত্র-নির্মাণে নীতিশিক্ষাদানে তাঁহার সহায়তা করিল। ধর্মপ্রচারকের রাশি রাশি বক্তৃতা, শিক্ষকের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ, পিতামাতার লালনপালন ও তাড়ন এই-সমস্ত একত্র হইয়া যাহা না করিতে পারিয়াছে তিন জন লোক (যাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার কোনো উপায় নাই) সেই নীতিশিক্ষাদান কার্য সম্পন্ন করিল। তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার মন ফিরিল, তাঁহার চিত্ত মথিত হইল, তিনি মনুষ্যের জন্য ভাবিতে, দুঃখ করিতে, সহানুভূতি করিতে শিখিলেন; কলেজের চারি-পাঁচ বৎসরে এই তিন মহাত্মার স্পিরিট তাঁহাকে যেরূপ গড়িয়া পিটিয়া দিল

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাহাই থাকিবেন। সংসারে কত যন্ত্রণা পাইতে হইবে কত কত কষ্টে পড়িতে হইবে তাঁহার কত পরিবর্ত হইবে কিন্তু আদত তিনি যাহা ছিলেন তাহাই থাকিবেন।

ভারতবর্ষে ইংরেজি-বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে, বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান উন্নতি হইবার আগে রামায়ণ ও মহাভারত যুবকদিগের চরিত্র নির্মাণ করিয়া দিত। কথকের মুখ হইতে, গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে বঙ্গীয় যুবক যে উপদেশ পাইতেন তাহা তাঁহার অস্থিমজ্জায় বিঁধিয়া থাকিত। আমরণ তিনি রাম বা যুধিষ্ঠিরকে দেবতা বলিয়া মনে মনে উপাসনা করিতেন ও উঁহাদিগেরই চরিত্র অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রপৌত্রদিগকে নিজ উপাস্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দিয়া যাইতেন। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে তিনি দেবতাব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করিতে ভাইকে ভালোবাসিতে প্রচলিত ধর্ম যে পথে চালায় সেই পথে চলিতে শিখিতেন। ঐ দুই অগাধ সাহিত্যসমুদ্র মন্থন করিয়া আপনার কার্যপ্রণালী নিরূপণ করিতেন। আজিকার বঙ্গীয় যুবক রামায়ণ ও মহাভারত পড়েন না। যদিও পড়েন তো রাম বা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে দেন না। যাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে একা আধিপত্য করেন তাঁহাদের নাম বায়রণ, কালিদাস ও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র। তিন জনই যুবকদিগের চিত্র আকর্ষণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবিশেষ; তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠকালে যুবকহৃদয় এমনি গলিয়া যায় যে শেষে তাঁহার যে পথে উহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করেন সেই পথেই উহা ধাবিত হয়।

রামায়ণ ও মহাভারত যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল তখন পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত প্রবল। এইজন্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান উপদেশ সৌভাত্র ও পারিবারিক প্রেম। রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকালে মনুষ্য দৌরাত্মময় অসভ্যাবস্থা হইতে সবেমাত্র স্থির সামাজিক অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং তৎকালীন সমাজের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের দ্বিতীয় উপদেশ, তৎসমাজের বিঘ্নকারীদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব তৃতীয়। মনুষ্যগণের দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণের দমন করিয়া শান্তিভাব ধারণ করানোই উক্ত কাব্যরত্নদ্বয়ের মূলমন্ত্র। বাল্মীকি ও বেদব্যাস অথবা তাঁহাদের অনুবাদক কাশীদাস ও কৃত্তিবাস আপন আঁপন উদ্দেশ্য সাধনে এতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন যে বঙ্গীয় যুবক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাদের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহার তিন-চারি পুরুষ পর্যন্ত একান্নবর্তী থাকিতে ভালোবাসিতেন। দেবতা-ব্রাহ্মণের তাঁহারা গোলাম হইয়াছিলেন, পরধর্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাব ভয়ানক প্রবল ছিল। পরধর্মের লোক তাঁহার শান্তিময় সমাজের যত কেন উপকারী হউক না তিনি তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু পশ্বাচার ও অসভ্যতা কমিতে কমিতে তাঁহাদের শক্তিরও হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। যাহা দমন করিবার জন্য বাল্মীকি বেদব্যাস হৃদয়বিদ্রাবিণী উন্মাদিনী কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন সেই পদার্থ সেই শক্তি লোপ হইয়াছিল। দৌরাত্মপ্রিয় উৎপাতপ্রিয় তেজস্বী আর্য যুবক কবিতার মোহিনীবলে মেষশাবকবৎ নিরীহ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের শক্তি স্বাধীনতা তেজ গিয়া উহা কারখানার একটি একটি

কলের মতো হইয়াছিল। যেমন বাষ্পীয় বলপ্রভাবে সহস্র সহস্র নলী একই ভাবে সকালে ছয়টা হইতে সায়াহ্নে ছয়টা পর্যন্ত চলে তেমনি বঙ্গীয় সহস্র সহস্র লোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত একই ভাবে চলিত। চালাইত কে? কোন বাষ্পীয় যন্ত্রের এরূপ অসীম শক্তি? হিন্দু সমাজের দমনশক্তি। যেমন মধুর সংগীতে বনের মত্ত হস্তী পোষ মানিয়া চালকের বশে চলে তেমনি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের মনোমোহিনী বীণার বশ হইয়া দুরন্ত শূরজবংশীয়েরাও দমন হইয়াছিল। বাঙালি তো কোন ছার।

আদিম অবস্থার সমাজ শাসনের প্রধান বিঘ্ন এই যে মনুষ্য কেহ কাহার অধীন হইতে চাহে না এবং সকলেই যাহা খুশি তাই করিতে চায়, সমাজবন্ধন করিতে গেলে obedience প্রথম প্রয়োজন। এইজন্য যাঁহারা প্রথম সমাজবন্ধন করিয়াছিলেন তাঁহারা ঐটি শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করেন। এক পুরুষে সকল উদ্ধত স্বভাব লোককে শাসনাধীন করা যায় না এইজন্য ১০/১৫ পুরুষ পর্যন্ত এক নিয়মে থাকিয়া সমাজ-মধ্যবর্তী সমস্ত লোককে বশ্যতা স্বীকার করানো চাহি। রামায়ণ ও মহাভারত এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্মিত। বহুকাল অবধি হিন্দুরা রাম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রানুকরণ করত সমাজশাসনের অধীন হইয়াছেন। সমাজও উত্তমরূপে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শুদ্ধ সমাজবন্ধনই তো মনুষ্যের উদ্দেশ্য নহে, সমাজবন্ধন পথ। এই পথে মনুষ্য সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিবে; ক্রমে জড়জগতের উপর আধিপত্য করিবে, আপন জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে। প্রথম আপন জাতির, ক্রমে আপন দেশের, তাহার পর সমস্ত মনুষ্যের, তাহার পর সমস্ত জীবলোকের উপকার করিবে। যাহাতে জীবলোক জড়ের সহায়তায় দীর্ঘকাল আনন্দ অনুভব করিয়া বিনাক্লেশে দেহত্যাগ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে তবে তো পথ সার্থক হইবে, নচেৎ বনমধ্যে পথ কাটিয়া রাখিলে তাহাতে লাভ কি?

সমাজ বদ্ধ হইল কিন্তু সমাজের উদ্দেশ্য কিছু রহিল না। যেমন রাম লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন দেখিয়া মনুষ্য শান্ত হইল সেইরূপ শান্ত হইয়া কী করিবে বুঝিতে পারিল না। তাহাতে এই হইল যে কতক লোক ভোগে আসক্ত হইল আর কতক এ জন্মের ভোগ ত্যাগ করত পরলোকের ভোগের জন্য ব্যস্ত হইল। কতক সুন্দরী রমণীসহবাসে বিচিত্র সুরাপানে রত হইয়া শীতে উষ্ণগৃহমধ্যে, গ্রীষ্মে প্রমোদ কাননে নির্ঝরগৃহে, জ্যোৎস্নায় ছাদোপরি, রৌদ্রে পুষ্করিণীমধ্যে বিহার করাই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিল। আবার অনেকে অগ্নিকুণ্ডোপরি ঊর্ধ্বপদে অধঃশিরে তপকরত পরলোকে নন্দনকাননে ঊর্বশী মেনকা পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখে অনন্তকাল কাটানোই মনুষ্য হওয়ার সুখ ভাবিলেন। কেহ দানে স্বর্গ, কেহ স্নানে স্বর্গ, মনে করিলেন। ইন্দ্রিয়সুখই সকলের উদ্দেশ্য হইল—কাহারো ইহলোকে কাহারো পরলোকে। কেহই এ কথা বুঝাইয়া দিল না যে মনুষ্যসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য জড়জগতের উপর মনুষ্যজাতীয় আধিপত্য বিস্তার, তুমি আমি এমন-কি আমার সমসাময়িক যে-কোনো ব্যক্তি হউন, সমাজ ছাড়িয়া ধরিলে কেহ কিছুই নহেন। যেমন আমরা আমাদের একপুরুষ আগেকার লোকে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভোগ করিতেছি, এইরূপ আমাদের পরে যাহারা আসিবে তাহাদের জন্য আমাদের পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশি রাখিয়া যাওয়া অর্থাৎ জড়জগতের কিছু আধিপত্য বিস্তার

করিয়া যাওয়া কর্তব্য। মনুষ্য সমাজবৃক্ষের পত্র। যেমন পত্র আকাশস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের আয়তন বৃদ্ধি করে পরে আপনার সময় আসিলে পড়িয়া যায় এবং পরবর্তী পত্রসকল যাহাতে একটু উচ্চ ও পুষ্ট হয় তাহা করিয়া যায় সেইরূপ মনুষ্য সমাজ বিস্তার করিয়া সমাজ পরিবর্ত ও সমাজ-সংস্কার করিয়া নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া দেহত্যাগ করে। তাহাদের সন্তানেরা এই সকলের ফলভোগ করত আরো অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করে।

এ কথা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে কেহ বুঝাইয়া দেন নাই সুতরাং সেই শান্তভাবে সেই রামায়ণ ও মহাভারত শুনিয়া একইভাবে চলিয়া আসিতেছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের উদ্দেশ্য সাধন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উহাদের পরিবর্তে গ্রহণ করা যায় এমন কোনো গ্রন্থ হয় নাই। এইজন্য উহারাই জাতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন ইংরেজি বিদ্যার চর্চা আরম্ভ হইল তখন অবধি রামায়ণ ও মহাভারতের নীতিশিক্ষা সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। সমালোচকেরা বাল্মীকির অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তির প্রশংসা করুন প্রত্নতত্ত্ববিদেরা রামায়ণ হইতে তৎসাময়িক বৃত্তান্ত রচনা করুন রামায়ণ পাঠ করিয়া শত শত লোক আনন্দসাগরে মগ্ন হউক কিন্তু রামের চরিত্র আর কেহ অনুকরণ করিতে যাইবে না। যুধিষ্ঠিরের তো কথাই নাই। পূর্বে লোকে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে যে শিক্ষা পাইত এখন শিক্ষিত যুবকগণ কতক পরজাতীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়া কতক ইতিহাস পড়িয়া কর্তৃক নানা পুস্তক ও ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া সেই শিক্ষা লাভ করেন। সুতরাং এরূপ সভ্য অবস্থায় একজন লোকের বা একখানি পুস্তকের যুবকচরিত্র নির্মাণে সর্বতোমুখী প্রভুতা হইতে পারে না। তথাপি কোমল হৃদয় যুবকের মনে যে পুস্তক ভালো লাগে তাহা হইতেই তিনি কিছু-না-কিছু ভালো জিনিষ চিরকাল মনে করিয়া রাখেন। যে-কিন্তু জিনিস চিরকাল মনে থাকে তাহা অনেক সময়ে কার্যে প্রকাশ পায় তাহাই তাঁহার চরিত্র নির্মাণে সহায়তা করে।

বঙ্গীয় যুবক যে-সমস্ত রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করেন তাহার মধ্যে শেকস্‌পীয়র সর্বপ্রধান। কিন্তু বোধ হয় তাঁহার চরিত্র নির্মাণে শেকসপীয়রের কোনো হাত নাই। কারণ শেকস্‌পীয়রের উদ্দেশ্য কেবল 'to please' তাঁহার সৎলোকও যেমন সুন্দর অসৎও তেমনি সুন্দর। এই দুই প্রকার চরিত্র পাঠ করিয়া যে-সকল ভাবের উদয় হয় তাহা পরস্পরকে কেনসেল (cancel) করিয়া দেয়। মিল্টনে puritanic spirit এত অধিক যে উহা কোনো কালে লোকে অনুকরণ করিতে সাহস করিবে না। অনেকে বরং শয়তান হইতে চাহিবে তো কেহ যীশু খৃষ্ট বা সামসন (মিল্টন রচিত Samson Agonistes, ১৬৭১ খৃ.) হইতে চাহিবে না। ড্রাইডেন ও পোপে অনুকরণীয় কিছু নাই। *An Essay on Criticism* (পোপ রচিত, ১৭১১ খৃ.) প্রভৃতি পুস্তক হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা উপদেশ মাত্র। স্কুল মাস্টারের উপদেশ যেমন এ-কান দিয়া ঢুকে ও-কান দিয়া বাহির হইয়া যায় ঠিক সেইরূপ। চসার ও স্পেন্‌সারের বানান এত উল্টা রকম যে কাহারো সাহস হয় না যে পড়ে, যদিও কেহ পড়ে তো চসার সেকেল গল্প, একেলে লোকের ভালোই লাগে না। যাহারা বৃদ্ধ তাহাদের বরং ভালো লাগিতে পারে যুবকের কখনোই

লাগিবে না। স্পেনসারের যে ideal তাহাও ইউরোপের অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মধ্যসময়ের, এখনকার লোকে তাহা ভালোবাসে না। বিশেষ রূপকের দ্বারা যে শিক্ষা লাভ হয়, সে শিক্ষা সভ্য সময়ের নয়। শেলি চমৎকার কিন্তু শেলির লেখা এত জটিল ও উহার লেখার idealism এত উচ্চ যে তাহা অনুকরণের অতীত। টেনিসনের উদ্দেশ্য পুরানো জিনিস ভালো করিয়া দেখানো সুতরাং তাহাতে চরিত্র নির্মাণে সহায়তা করে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভালোই হউক আর মন্দই হউক নিঙরিয়া তিতো করিয়া দেন। একটি ফুল যদি তিনি ধরিলেন তো তাহার প্রতি পাপড়ির বর্ণনা হবে, তার কেশরের বর্ণনা হবে, তাহার রেণুর বর্ণনা হবে, তবে ছাড়িবেন। বাকি বায়রন, তিনি পীড়িতের বন্ধু, পীড়কের শত্রু, প্রণয়ের আধার, যৌবন মূর্তিমান, মহা-তেজস্বী, সর্বদা চঞ্চল, আলস্যের, জনসমাজের অত্যাচারে একান্ত চটা। যৌবনের মন আকর্ষণে যা-কিছু চাই বায়রণের সব আছে। সুতরাং ইংরেজি সাহিত্যে এক বায়রনই বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র নির্মাণে অংশী।

সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে রামায়ণ মহাভার তো সেকেলে। বেদপুরাণের চর্চা নাই। থাকিলেও এখন আর কেহ গর্গ বিশ্বামিত্র অগস্ত্য হইতে চাহিবে না এ এক প্রকার ঠিক। সে সমাজ নাই সে কালও নাই। কালেজের ছাত্র দূরে থাক, ভট্টাচার্যদিগের টোলের ছাত্রেরাও আর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বেদব্যাস হইতে চাহে না। ভারবির অর্জুন ('কিরাতার্জুনীয়'), মাঘের কৃষ্ণ ('শিশুপালবধ'), নৈষধের নল (শ্রীহর্ষ রচিত 'নৈষধচরিত'), বাণভট্টের তারাপীড়, ('কাদম্বরী'), শ্রীহর্ষ সব সেকেলে, একটিও আমাদের মনের মতো নয়। ভারবি মাঘ নৈষধ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনা-প্রণালী সমালোচকেরা ভালো বলিতে পারেন, স্থানে স্থানে ভালোও আছে কিন্তু সব সেকেল। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি উহাদের রসবোধ করিয়া উঠিতে পারি না। করিতে পারিলেও আমাদের চরিত্র পরিবর্তন বা শোধন ভারবি পড়িয়া হয় না। বঙ্গীয় যুবক ভবভূতিকে ভালোবাসেন। ভবভূতি তাঁহাদের ভালোও লাগে, উহা তাঁহার চরিত্রেরও কতক প্রকাশ পায় কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প বিষয়ে, কাজেই এ স্থলে গৃহীত হইল না। 'দশকুমার চরিতে'র (দণ্ডী রচিত) মধ্যে অপহারবর্মার চরিত্র সুন্দর, বড়ো চমৎকার কিন্তু তিনি চোর ডাকাত ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি অপহারবর্মার চরিত্র হইতে বঙ্গীয় যুবক নিজে কিছু লইয়া থাকেন তাহা তিনি মানের খাতিরে লুকাইয়া রাখিবেন কখনো প্রকাশ করিবেন না। বাকি কালিদাস, কালিদাসের লেখা এমনি মধুর যে পড়িবামাত্র মন আকৃষ্ট হয়। তারপর কালিদাসের অনেকগুলি পাত্র (character) লোকে এত ভালোবাসে যে খানিকটা সেই রকম হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের যুবকগণের উপর কালিদাসের ক্ষমতাও অনেক অধিক।

বাংলা সাহিত্যের অনেক গ্রন্থকারেরই কিছু কিছু অংশ আমরা পাইয়া থাকি। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান বঙ্কিমবাবু। বঙ্কিমবাবু পুস্তকাবলী এত লোকে পাঠ করে ও এত আদরের সহিত পাঠ করে যে তাঁহার সকল পুস্তক হইতেই কিছু-না-কিছু লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে। লোকে দীনবন্ধুর ইয়ার্কি মুখস্থ করে, হুতোমের গানগুলি কণ্ঠস্থ করে, মাইকেলের কতক কতক অনুকরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ আজগুবি কথা লইয়া ভিরকুটি করে। হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত"

সকলের কণ্ঠস্থ আছে—'বৃত্রসংহার' পাঠে চরিত্র পরিবর্তন কতদূর হইবে আজি জানিবার উপায় নাই। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ দূরে থাকুক এক্ষণে অনেকে লজ্জায় তাহা পড়িতেই পারে না। আরো অনেক গ্রন্থকার আছেন কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা অতি সামান্য।

এখন দেখিতে হইবে এই তিনজন কবির কে কত দূর ও কিরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা গ্রন্থকারদিগের দোষগুণ পর্যালোচনা করিতেছি না; কেবল শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্র নির্মাণে ইঁহারা কে কী প্রকার ও কী পরিমাণে মালমসলা দিয়া থাকেন তাহাই দেখিব। ইঁহারা একজন ইংলন্ডের একজন মালবের আর একজন বঙ্গের। এই তিন জনের মধ্যে একজন ফরাসি বিপ্লবের সময় শিক্ষিত, একজন হিন্দুদিগের গৌরব সময়ের ব্যক্তি আর একজন ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্যকালীন ইংরেজি রূপে শিক্ষিত। একজন সমাজ ভাঙিতে, সমাজের অত্যাচারী নিয়মাবলী পরিবর্তন করিতে শিক্ষা দেন, সমাজ ছাড়িয়া গেলে কিরূপ সুখ হয় তাহাই দেখান। একজন সমাজে থাকিয়া কত দূর সুখভোগ করা যাইতে পারে তাহাই দেখান আর একজন সমাজের সহায়তায় ও উহার বিরোধে কিরূপ আনন্দ অনুভব করা যায় দেখাইয়া শেষ করেন।

তিন জনেই প্রণয়ের কবি, প্রণয়গত অবশ্য তারতম্য আছে তাহা আমাদের এখানে বলা প্রয়োজন নাই। তিন জনেই স্বভাবের সৌন্দর্য অনুভব করিতে শিক্ষা দেন। তিন জনেই নিজে স্বভাবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ এবং তিন জনেই লোককে আপন আপন মুগ্ধতায় অংশী করিতে পারেন। বাংলায় পর্বত নাই, পাহাড় নাই, কেবল এক হরিদ্বর্ণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আর মাঝে মাঝে বিশালনিতম্বা স্রোতস্বিনী আর নির্মেঘ ও সমেঘ আকাশ। হঠাৎ মনে হইতে পারে বাংলায় স্বভাবসৌন্দর্য নাই, কিন্তু বঙ্কিমবাবুর প্রতি ছত্রে বাংলার সেই সৌন্দর্য প্রকটিত। বাংলার সৌন্দর্য তিনিই সর্বপ্রথম কবির চক্ষে দেখিয়াছেন ও আমাদের সৌভাগ্য ছিল বলিয়া আমরাও তাঁহার হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত সেই অপূর্ব সৌন্দর্য আরো সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাইয়াছি। সেকালে স্বভাবের শোভানুভবের নাম দেবতার আরাধনা ছিল। প্রসন্নপুণ্যসলিলা গঙ্গা দেবতা, আকাশ ঋষিপূর্ণ, চন্দ্র দেবতা, সূর্য দেবতা; বঙ্কিমবাবু দেবতাদিগকে অন্তরিত করিয়া শুদ্ধ সৌন্দর্যমাত্র দেখাইয়াছেন ও দেখিতে বলিয়াছেন। বাংলার যে-কিছু সৌন্দর্য তাহার প্রায় কিছুই বঙ্কিমবাবু দেখাইতে ছাড়েন নাই। হীরার বাড়ির দেয়ালে পাখি আঁকা হইতে সূর্যমুখীর বিচিত্র চিত্রবর্ধিত গৃহ পর্যন্ত সবই দেখাইয়াছেন। তাঁহার চিত্রে অপরিষ্কার কিছুই নাই। সব পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে।

কালিদাসের বর্ণনা ভারতময়। সিংহল দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাসপর্বত পর্যন্ত সব কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা শুদ্ধ পরিষ্কার নয় বড়ো উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়, যেন ইলেকট্রিক আলোকে (electric light) প্রতিফলিত। স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ভারতবর্ষ জগতের অনুকৃতি, আর কালিদাস এই সমস্ত ঘুঁটিয়া ফেলিয়াছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখানো তাঁহার কর্ম নয় সেজন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ চাই। তাঁহার দেখানো বাছিয়া বাছিয়া, ভালো ভালো বস্তুগুলি। তাঁহার বর্ণনায় শুদ্ধ সৌন্দর্য নয় কিছু-না-কিছু অলৌকিক উহার সঙ্গে মিশ্রিত আছে। যথা রামের পুষ্পকরথ ('রঘুবংশ', ত্রয়োদশ সর্গ), মেঘের দৌত্য ('মেঘদূত')। তাঁহার ঋতুসংহারে স্বভাবের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে। এখানকার বর্ণনায় অলৌকিকতা নাই

এবং পরিষ্কার অপরিষ্কার জ্ঞানও বড়ো বেশি নাই। কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু পরিষ্কারই হউক আর অপরিষ্কারই হউক বর্ণনায় হৃদয়গ্রাহিত্ব সমানই আছে।

বায়রনের (George Gordon Noel Byron, ১৭৮৮-১৮২৪ খৃ.) বর্ণনীয় ইউরোপ। সমস্ত ইউরোপে যা-কিছু বর্ণনাযোগ্য—আল্‌পসের চূড়া, রাইনের বিশাল জলপ্রবাহ, গ্রীসের দ্বীপমালা, মাইকেল এঞ্জিলোর (Michelangelo, Buonarroti, ১৪৭৫-১৫৬৪ খৃ.) চিত্র, ভিনিস ও রোমের ভগ্নাবশেষ। শিল্পে ও স্বভাবে যে-কিছু মহান ও মনোহর, সকলই তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার বর্ণনামধ্যে এক জিনিস আছে যাহা আর প্রায় কাহারো নাই। ঐতিহাসিক দৃশ্যবর্ণনে বায়রনের অসাধারণ ক্ষমতা ওয়াটারলুর যুদ্ধ, রুসের নিবাসস্থান, বল্‌ডেরের গির্জা বর্ণনায় বায়রন তাঁহার বিশাল হৃদয়ের পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই-সকল বর্ণনার পর তাঁহার উপদেশগুলি যুবকমণ্ডলীর অন্তঃকরণে এরূপ অঙ্কিত হয় যে তাহা আর অপনীত হইবার নহে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যুবকদিগের চরিত্র নির্মাণের কথায় স্বভাবের বর্ণনা আসিল কেন? এ ধান ভানিতে শিবের গীত কেন? তাহার উত্তর এই স্বভাব বর্ণনায়ও নীতিশিক্ষা আছে, আর সেটি দেখানো বড়ো সহজ, এইজন্য আগে স্বভাবের শোভা বর্ণিত দেখিয়া কী শিক্ষা পাই দেখাই, তাহার পর অন্য প্রকার শিক্ষা যথাশক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম, কালিদাসের বর্ণনায় সব শান্তিময় সব সুখময়, পড়িলে মনের শান্তিময় ভাব জন্মে। যখন ভট্টাচার্য মহাশয়েরা, পাদরি সাহেবেরা ও ব্রাহ্ম মিশনরিগণ দিনরাত জগৎ দুঃখময় পাপের ভরে ডুবল ডুবল বলিতেছেন, তখন ওরূপ পুস্তক পড়িলে বাস্তবিকই জগৎ দুঃখময় নহে বলিয়া বোধ হয়। এ বড়ো সামান্য শিক্ষা নহে। বঙ্কিমবাবুর স্বভাব বর্ণনায় শুদ্ধ শান্তি নয় তাহার উপর যেন একটু কিছু আছে, যেন যে আনন্দ যৌবনের বড়ো প্রিয় সেইরূপ আনন্দ যেন বেশি আছে। বায়রণের বর্ণনায় শান্তি নাই, কেবল পরিবর্ত হইতেছে, অসংখ্য পরিবর্ত, এটা ছেড়ে ওটা, ওটা ছেড়ে সেটা, যেন তৃপ্তি হইতেছে না, যেন একটু চটা চটা ভাব উদয় হইতেছে, যেন যাহার অন্বেষণে স্বভাবের শোভা দেখিতে আসিয়াছি, সে সুখটুকু পাইতেছি না, কেবল কৌতূহলতৃষ্ণায় কাতর হইয়া যাহা-কিছু সুন্দর দেখিতেছি, দেখিতে যাইতেছি, দেখিতেছি, তৃপ্তি হইতেছে, কিন্তু সে তৃপ্তি বেশিক্ষণ থাকিতেছে না।

সংক্ষেপে তিন জনের বর্ণনায় তিনরূপ উদ্দেশ্য আর-এক প্রকারে দেখানো যায়। কালিদাস উপরে বসিয়া বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত নিচেকার শোভা দেখিতেছেন আর দেখাইতেছেন। নিজে মনুষ্যের উপর উঠিয়া, বসিয়া মনুষ্যের কার্য আচার ব্যবহার নৃত্যগীত দেখিতেছেন। পাহাড় পর্বত কেমন ছোটো ছোটো দেখাইতেছে, নদীটি একছড়া হারের মতো কেমন পড়িয়া আছে তাই দেখিতেছেন আর কাছে কোনো ভালোবাসার জিনিস আছে তাহাকে দেখাইতেছেন। যেন সাঙ্খ্যমতে পুরুষ নির্লিপ্ত বসিয়া প্রকৃতির রঙ্গ দেখিতেছেন। কালিদাস বলিতেছেন আগে মানুষের চেয়ে উচ্চ জীব হও, তাহার পর স্বভাবের শোভা দেখিও কত আনন্দ পাইবে। তাঁহার আশা বড়ো উচ্চ। বঙ্কিমবাবুর স্বভাব-শোভার কেন্দ্র মনুষ্য, নগেন্দ্রনাথই হউন আর অমরনাথই

হউন, আর গোবিন্দলালই হউন বা স্বয়ং বঙ্কিমবাবুই হউন, তাঁহারো নির্লিপ্ত দেখা, স্বভাব শোভা মধ্যে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখো আর কাছে যদি কেহ থাকে দেখাও কেমন সুন্দর কেমন গভীর। পৃথিবী ও আকাশ দেখিয়া ঈশ্বরের প্রেমে শরীর পুলকিত হউক। বায়রনের তা নয়। স্বভাবের শোভা দেখিতে চাও ঘরদোর ছাড়িয়া বাহির হও যা তোমার সম্মুখে পড়িবে তাই দেখিয়া বসিয়া থাকিবে? তা নয়। চলো যেখানে সুন্দর বস্তু, সেইখানে যাইতে হইবে। তুমি নির্লিপ্ত থাকিলে সব দেখিতে পাইবে কেন? ঘরে বসিয়া দুনিয়ার কারচুপি দেখিয়া শান্তিসুখ ভোগ করিবে কেন? মনুষ্যের জীবন অল্প, ইহাতে সব দেখিয়া শুনিয়া লও, যত দেখিবে, ততই জ্ঞান বাড়িবে, আনন্দ অধিক হইবে এই আনন্দই আনন্দ, আর সব কেবল দুঃখ আর অত্যাচার, সমাজ অত্যাচার, প্রণয় অত্যাচার, মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিতে ভালোবাসে। সবই কষ্ট কেবল স্বভাবের আনন্দই পরমানন্দ।

একজন উপর হইতে স্বভাব দেখিতেছেন। একজন মধ্য হইতে দেখিতেছেন আর একজন মাতিয়া বেড়াইতেছেন। একজনের মতে মনুষ্যজীবন অপেক্ষা অন্য জীবনে সুখ অধিক। আর একজনের মতে এ জগতেও যথেষ্ট আনন্দ। তৃতীয়ের সবই এই জগতে।

বায়রনের জন্ম ১৯ শতাব্দীর প্রজাবিপ্লবে (ফরাসি বিপ্লব)। সুতরাং বর্তমান সমাজের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে বর্তমান সমাজে অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট মনুষ্যচিত্রগুলি সমাজের বাহিরে। সেগুলি সকলেই সমাজের উপর চটা। কেহ কেহ আবার সমাজের শত্রু; হয় দস্যু নয় মনুষ্যবিদ্বেষী (misanthrope)। সমাজের যতগুলি নিয়ম আছে সবগুলিই তাঁহার চক্ষুশূল। কন্‌রাড, লারা, ডন জুয়ান প্রভৃতি পাত্রগণের বাক্যেও অপার্থে (অপার্থে?) এই সমাজবিদ্বেষভাব প্রতি মুহূর্তে প্রকাশিত হইতেছে।

কালিদাসের সমাজ মনুর সময় হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে। চুলমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার মত এই এরূপ সমাজে সকলই সুখ।

বঙ্কিমবাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের সমাজ। তিনি দেখাইয়াছেন সমাজের বিরোধী কাজ করিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না। এবং করিলেই শেষ আত্মদুষ্কৃতের জন্য সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের অবৈধ প্রণয়ের ফল তাঁহার ঘোর আধ্যাত্মিক বিকার; শৈবালিনীর অবৈধ অনুরাগের ফল পর্বতগুহায় ঘোর প্রায়শ্চিত্ত। গোবিন্দলালের ও রোহিনীর যেরূপ অন্ত হইল তাহাতেও ঐ কথা দৃঢ়তর রূপে প্রতিপন্ন করিতেছে।

বায়রনেরও একটি মানুষ সুখী নহে, তাহাদের মধ্যে মধ্যে অলৌকিক অতিমানুষিক হৃদয়প্রমাদক আনন্দ আছে বটে কিন্তু দুঃখই সকলের স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু তাহারা ঠিক জানে যে যতদিন বর্তমান সমাজ এইভাবে চলিবে তাহাদের দুঃখের অবসান হইবে না। সুতরাং তাহারা অনুতাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতে চাহে না। তাহাদের আমোদ সমাজের উপর অত্যাচারে। কেহ দিবারাত্র লুঠপাঠ করিতেছে, কেহ নির্জন কারাগৃহমধ্যে উচ্চে রোদন করিয়া সমাজধ্বংসের জন্য শাপ দিতেছে, কেহ সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য দিনরাত্রি ফিরিতেছে। তাহারা দুঃখী বটে কিন্তু দঃখে কাতর নহে, তাহাদের দুঃখের কারণ মনুষ্যসমাজ, সুতরাং মনুষ্যসমাজ ও

যাহারা সেই সমাজ চালায় তাহাদের উপর দাদ তোলা চাই। বায়রনের মানুষ মনুষ্যসমাজের উপর চটা। কিন্তু মনুষ্যের প্রতি, দুর্বলের প্রতি, স্ত্রীলোকের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি বিলক্ষণ আছে। তাহারা মানুষ ভালোবাসিতে চায় কিন্তু সমাজের অত্যাচারী নিয়ম আপনার মনের মতো করিয়া ভালোবাসিতে দেয় না; সুখে তাহারা ঘোর চটা। কালিদাসের মানুষ মানুষ হইতে কিছু উচ্চ। সব দেবতার অংশ, কেহ দেবতার অবতার, কেহ দেবতা স্বয়ং, কেহ অপ্সরা, কেহ অপ্সরার কন্যা, কেহ ঋষি, কেহ রাজা। ঋষি ও রাজা মানুষ কিন্তু বায়রনের মানুষ অপেক্ষা তাহাদের অতিমানুষিক ক্ষমতা অধিক। এই স্বর্গে যাইতেছে মুহূর্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে সমস্ত পৃথিবী মুহূর্তে পরিভ্রমণ করিতেছে, দেবতার সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করিতেছে অপ্সরার সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু সকলেই সেই মনু-প্রণীত সমাজের নিয়ম যত্নপূর্বক প্রতিপালন করিতেছে। মানুষের অসীম ক্ষমতা কিন্তু যথেষ্টাচার নাই।

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্যয়ঃ।[১]

এই শ্লোকে তাহাদের চরিত্রের কতকটা আদর্শ পাওয়া যায়। তাহাদের যেমন ক্ষমতার পার নাই মনের জোরও তেমনই অধিক। সেই ক্ষমতা তাঁহারা সৎপথে চালাইতে জানেন, সুতরাং তাঁহাদের জীবনে কষ্ট নাই দুঃখ নাই। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, যেমন স্বভাবের নিয়ম অলঙ্ঘনীয় তেমনি তাঁহাদের মতে সমাজের নিয়মও অলঙ্ঘনীয়। লঙ্ঘনের চেষ্টাও নাই, পীড়াও নাই, অনুতাপও নাই।

বঙ্কিমবাবুর লোক সব সমাজের লোক, শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক। শিক্ষিত যুবকের জীবন কেবল অনন্তবিবাদসঙ্কুল। তিনি দুই প্রকার শিক্ষা পান। এক প্রকার বাড়িতে আর-এক প্রকার স্কুলে। উভয় প্রকার শিক্ষা সময়ে সময়ে পরস্পর বিলক্ষণ বিরোধী। এইজন্য শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর পাত্রগুলিতেও এই বিরোধী ভাব কতক কতক প্রকটিত আছে কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। যেখানে আছে সেখানে অতি মনোহর। বঙ্কিমবাবুর মানুষগুলি দেশী বাঙালি, নিরীহ ভালোমানুষ। বাঙালিরা যে স্বভাব ভালোবাসে তাহারা সকলেই ঠিক সেই স্বভাবের লোক। বুদ্ধিমান চতুর দয়ালু সামাজিক ও গুণগ্রাহী তাহাদের হৃদয়ের ভাব গভীর। এরূপ লোকের হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মানুসুক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপদ, তাহা হইতে আমাদের অনেক জ্ঞানলাভ হয়। বঙ্কিমবাবু ইহাদিগের সেইরূপে দেখাইয়াছেন।

রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন পুস্তকাবলীর প্রথম শিক্ষা এই যে পিতামাতার বশ হইবে ভাইকে স্নেহ করিবে জ্ঞাতিদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে কিন্তু আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে যে কবিত্রয় আধিপত্য করেন তাঁহাদের পিতামাতার সঙ্গে খোঁজ নাই। বঙ্কিমবাবু একবার গোবিন্দলালের মাকে বাহির করিলেন কিন্তু পাছে কোনোরূপ গোল ঘটে চটপট উদ্যোগ করিয়া তাহাকে কাশী পাঠাইয়া দিলেন। বঙ্কিমবাবুর কোনো নায়ক বা নায়িকার ভাই নাই। দুই-একটি ভগিনী আছে। গোবিন্দলালের পিতৃব্যপুত্র হরলাল সেও কলিকাতায় থাকে। বায়রনেরও বাপ মা ভাইয়ের সঙ্গে বড়ো সম্পর্ক নাই। ডন জুয়ানের মুখে ডনা ইনেজের (Donna Inez) নামও

শুনিতে পাওয়া যায় না। আজো (Azo) পারিসিনার (Parisina) কথার উল্লেখই আর প্রয়োজন নাই। কালিদাসের পুস্তকেও পিতামাতা বড়োই অল্প কিন্তু অপরদ্বয়ের ন্যায় লোপাপত্তি নাই। অনেক অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মধ্যে দুই-একবার বিশুদ্ধ সৌভ্রাত্র প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বড়ো অল্প।

এই-সকল পারিবারিক অনুরাগের পরিবর্তে আমাদের কবিরা প্রতিনিধি দেন দাম্পত্য প্রণয়। দাম্পত্যই বা কেন বলি বায়রন তো দাম্পত্যের কোনো ধারই ধারেন না। শুধু প্রণয় বলি। সুতরাং বায়রনের পারিবারিক অনুরাগের কিছুই নাই। বঙ্কিমবাবুর পুস্তকে পারিবারিক অনুরাগের মধ্যে শুদ্ধ দাম্পত্যপ্রণয় আছে। অন্যান্য অনুরাগের পরিবর্তে বঙ্কিমবাবুর স্বদেশানুরাগ, বায়রনের মানবজাতির প্রতি অনুরাগ। একজন অত্যাচারপীড়িত স্বদেশের জন্য কাঁদিতে শিখাইয়াছেন আর-একজন অত্যাচারপীড়িত মনুষ্যজাতির উদ্ধারের জন্য অস্ত্রধারম করিতে শিখাইয়াছেন। যাহার ক্ষমতাবলে অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি পায় তাহাদিগকে বাহবা দিতে শিখাইয়াছেন।

কালিদাসের সমাজ ঠিক মনু হইতে এক আকারে চলিয়া আসিতেছে। তাহার যাহা কিছু আছে সকলই শাস্ত্রসংগত যুক্তিসংগত অণুমাত্র তফাত নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে প্রলোভন নাই। পাপ পুণ্যের মধ্যে পাপ বড়ো কম সবই পুণ্য। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্ধ কেবল সুখের ছবি, নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আমোদের ছবি। বায়রন পাপ পুণ্য বলিয়া দুইটি পদার্থ স্বীকার করিতে চান না। সুতরাং লোকে যাহাকে প্রলোভন বলে সে বস্তু তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মনুষ্য আপন ইচ্ছায় যাহা করে তাহাই ঠিক, আপন ইচ্ছায় যাহাকে ভালোবাসে সেই প্রণয়ের পাত্র। সুতরাং মনুষ্য আপনার সুখের জন্য আত্মইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কখনো কৃতকার্য হয় কখনো অকৃতকার্য হয়, পরের কথায় কিছুই করিতে চাহে না সমাজের যে-সকল নিয়ম আছে মানিতে চাহে না। বর্তমান সমাজের যেরূপ গঠন তাহাতে সমাজ এরূপ স্বেচ্ছাচারীদিগকে দমন করিতে চায় সুতরাং উহারা সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। যে সমাজে ইচ্ছার প্রতিরোধ না থাকে তাহারা সেইরূপ নূতন সমাজ চাহে, তাহা পায় না বলিয়া ঘোরতর সমাজন্বেষী হইয়া পড়ে।

বঙ্কিমবাবুর এক হাতে কালিদাস আর-এক হাতে বায়রন কিন্তু কালিদাসের আধিপত্য তাঁহার উপর অধিক। তিনি সমাজ সেই প্রাচীন-রীতিতে চালাইতে যান। সেই জিতেন্দ্রিয় ভাব সেই সুখ সেই শান্তি কিন্তু ইচ্ছাশক্তি এক-এক সময়ে দুর্দম হইয়া উঠে। এইটি বায়রনের। তিনি লাগাম ছাড়িয়া দিয়া দেখান যে ইন্দ্রিয় বশ করিতে না পারিলে লোকের পদে পদে বিপদ ঘটে। তিনি একবার প্রলোভন লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেন; দেখান সকলেই প্রলোভনে ভুলে কিন্তু কেহ অন্তরের ভাব অন্তরেই রাখে, দমন করে। ইহারাই জিতেন্দ্রিয় যথা প্রতাপ। কেহ বা রাখিতে পারে না দমন করিতে পারে না যথা শৈবলিনী ও নগেন্দ্রনাথ। যেই জিতেন্দ্রিয় সেই সুখী সাহসী সর্বত্র প্রশংসাপাত্র। যে অজিতেন্দ্রিয় সেই দুঃখী সাহসশূন্য এবং আত্মগ্লানিপূর্ণ।

কালিদাসের প্রলোভন নাই। বায়রনের সবই প্রলোভন কিন্তু তাহা হইতে উঠিবার ইচ্ছা

নাই। বঙ্কিমবাবুর প্রলোভন আছে; তাহার দুঃখ আছে ও তাহা হইতে উদ্ধার হইলে সুখও আছে। সুতরাং আধুনিক সমাজে আমরা বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ হইতে উচ্চতর নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

বায়রন হইতে আমরা মানবজাতির প্রতি অনুরাগ করিতে শিখি বটে কিন্তু তিনি স্পষ্ট শিক্ষা কোথাও দেন নাই। তিনি বর্তমান সমাজের অনেক নিন্দা করিয়াছেন। অত্যাচার-পীড়িতদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার মতলব টের পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ হইতে আমরা যে স্বদেশানুরগের উপদেশ পাই সে আর-একরূপ। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতকগুলি মূর্তিমান স্বদেশানুরাগ আছে। যথা রমানন্দ স্বামীর। এই সকল লোকের কী আশ্চর্য গঠন। তাঁহার যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহার নাম পরহিতব্রত। পীড়িত যে ধর্মাবলম্বী হউক-না-কেন, মুসলমান হউক, হিন্দু হউক, খৃস্টিয়ান হউক, তাহার উপকারের জন্য সর্বদাই উদ্যুক্ত। ইঁহারা নিজ জীবন পরের উপকারের জন্য তৃণবৎ ত্যাগ করিতে কাতর হন না। নৈতিক উন্নতির বোধ হয় রমানন্দ স্বামীই পরাকাষ্ঠা, কালিদাস হইতে আমরা আর-এক প্রকার অনুরাগের উপদেশ পাই। তাহার নাম সর্বভূতানুরাগ। এ অনুরাগ বুদ্ধধর্মের ফল। কালিদাসের সময়ে যদিও উক্ত ধর্মের লোপাপত্তি হইয়াছিল তথাপি উহার অনেক অংশে হিন্দুদিগের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় মাংসাশী যুবকবৃন্দ সর্বভূতে দয়ার বড়ো একটা সম্পর্ক রাখেন না। তাঁহাদের মতে মানবজাতির প্রতি অনুরাগই মুখ্য ধর্ম।

কালিদাসের শকুন্তলার লতা পাতা হরিণ মৃগ প্রভৃতির সোদরস্নেহ। আমরাও ফুলগাছ পুঁতি গোরু বাছুর পুষি কিন্তু তাহাদের উপর আমাদের সোদরস্নেহ হয় না। কিন্তু কালিদাসের হৃদয় পশুদিগের জন্যও কাঁদিত, আমাদের কাঁদে না। বঙ্কিমবাবুর নগেন্দ্রনাথ প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। আমাদের স্নেহ বড়ো ঐ পর্যন্তই নামে। বায়রন সকল মানুষেরই প্রতি স্নেহ করেন। তাহার সাক্ষী তাঁহার গ্রন্থে দুর্দশাপন্ন গ্রীকদিগের জন্য গভীর রোদন ও তাহাদের দুর্গতিনাশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লোকের মন আকৃষ্ট করা।

আর-একটি কথা। ইঁহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী কি একরূপ? সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলেন যে, বেদ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা আজ্ঞা, পুরাণ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা বন্ধুর উপদেশের ন্যায় সুপরামর্শ, কিন্তু কাব্য হইতে যে উপদেশ পাই তাহা কান্তার উপদেশের ন্যায় ('কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে'—মম্মটভট্ট)। কান্তা যেমন নানা প্রকার গল্পগুজব করিয়া মনটি লওয়াইয়া শেষ উপদেশটি বাহির করেন, যেটি বাহির করেন সেটি কিন্তু অমোঘ। কবি রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা করিলেন; নানা রূপ বিচিত্র পদার্থ দেখাইলেন, কখনো হাসাইলেন কখনো কাঁদাইলেন, শেষ একটি উপদেশ দিলেন যে, ইন্দ্রিয়-অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিলে অনেক নাতানে পড়িতে হয় শেষ রাবণের ন্যায় সপুরী বিনাশও হইতে পারে। ইঁহাদের তিন জনেরও শিক্ষাপ্রণালী মূলত তাই কেবল কিছু তারতম্য মাত্র আছে।

কালিদাসের উপদেশ প্রদানপ্রণালী ঠিকই এইরূপ। তিনি কোথাও preach করেন না।

তাঁহার কাব্যের মুখে যাহা পড়ে তাহাই বলিয়া যান, কখনো উপদেশ দিব বলিয়া দোকান খুলিয়া বসেন না। বায়রনের প্রত্যেক চিত্রেই কিছু-না-কিছু উপদেশ আছে। তাঁহার যেখানে একটি সুন্দর বর্ণনা তাহার নিচেই দুটি বর্তমান সমাজের অত্যাচারের নিন্দা। যেখানে যাও, দু-পাঁচটি ব্যঙ্গাত্মক উপদেশ নিশ্চয়ই পাইবে। যেমন কোনো গোরস্থানে ভ্রমণকালে গোরস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে তাহার নিচে যে-সকল খোদা অক্ষর দেখিলে তাহা অনেক দিন মনে থাকে, সেইরূপ বায়রনের খোদা কথা অন্তরের সঙ্গে গাঁথা থাকে। রাইনের ধারে রাইনের শোভা দেখিতে দেখিতে বা আল্‌পসের চূড়ায় আল্‌পসের শোভা দেখিতে দেখিতে অথবা হাএদী (Haidee) ও জুয়ানের নিশীথপ্রণয় দেখিতে দেখিতে বায়রন যে সকল গভীর নৈতিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠক-হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। বায়রনের মাঝে মাঝে preachingও আছে। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর preaching বড়ো উচ্চ। তাঁহার 'কমলাকান্তের দপ্তর' একটি preaching-এর খনি। কত নীতিশিক্ষা উহা হইতে লাভ করা যায়, তাহা বলা যায় না। তাঁহার preach করার লোকও আছে, তাঁহার সন্ন্যাসীগুলি সব নীতিশিক্ষার প্রচারক। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্বগতবাণীগুলিও প্রচারক ভিন্ন কিছুই নহে। হরদেব ঘোষালের পত্র অনেক মনোবিজ্ঞানতত্ত্বের গুঢ় সত্য আবিষ্কার করিয়াছে।

লোকে মনে করেন যে বায়রন হইতে আবার কী নীতিশিক্ষা, বায়রন অতি অশ্লীল কবি। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদের বায়রন নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহাদের নীতি সেকেল, বায়রন, একেলে নীতিশিক্ষা দেন। তিনি রুসোর (Jean Jacques Rousseau, ১৭১২-৭৮ খৃ.) স্কুলে তৈয়ারি হইয়াছেন। মানুষ সব সমান। সমাজবন্ধন শুদ্ধ দু-পাঁচ জন লোকের হাতে, অত্যাচারের ও যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা দিয়া তাহারা অবশিষ্ট মানবমণ্ডলীকে নির্বীর্য ও নিস্তেজ করে। এ অবস্থায় পরিবর্তন প্রয়োজন। তাঁহার কাব্যেও এই ভাব নিরন্তর প্রকাশিত। তাঁহার নিজের ও তৎকম্পিত মানবগণ যদিও দেখিতে মনুষ্যবিদ্বেষী যদিও তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যুবক ও অনেকে এই ভাবই বিলক্ষণ প্রাপ্ত হয় তথাপি একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এটি বাহিরে মাত্র, তাঁহার বিদ্বেষ শুদ্ধ বর্তমান সমাজের উপর কিন্তু উহার নিচে মনুষ্যের জন্য সহানুভূতি পরিপূর্ণ।

বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের পরহিতব্রত যদিও বায়রনের পরহিতব্রত অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নহে কিন্তু উহা তাঁহার পুস্তকে অধিকাংশ স্থলেই শুদ্ধ স্বদেশানুরাগেই পর্যবসিত। এইজন্য আমরা তাঁহার পুস্তকের উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগই বলিলাম।

উপসংহারকালে সংক্ষেপে বলি, বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগ ও সামাজিক সুখ, কালিদাসের ভূতানুরাগ ও সামাজিক সুখ, বায়রনের মনুষ্যানুরাগ (humanitarianism) ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের সুখ।